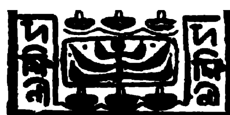
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা

শুভ গুহঠাকুরতা

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা





"দক্ষিণী" প্রকাশন বিভাগ ॥ কলিকাতা ২৯

প্রকাশ
প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৫৭

প্রকাশক
সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত
দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ
১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক
দেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

বাঁধিয়েছেন
পুস্তক বন্ধন প্রতিষ্ঠান
৬৬।১এ বৈঠকখানা রোড

পরিবেশক
সিগনেট বুকশপ
১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম পাঁচ টাকা

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীচরণেষু—

শৈলজাদা—

রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনেকের কাছ থেকেই শিখেছি এবং বহুভাবেই সংগ্রহ করেছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানকে সঠিক ভাবে জানবার প্রেরণা ও উৎসাহ আপনিই দিয়েছিলেন। আমার কার্য্যক্রমে আপনি বরাবরই সাহায্য করেছেন এবং বহুভাবে বহু ভুলভ্রান্তি শুধরে দিয়েছেন। আমার নানা অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যেটুকু লিপিবদ্ধ করতে সাহসী হয়েছি তা আপনাকেই নিবেদন করলাম। ইতি

প্রণত

শুভ

গ্রন্থকারের নিবেদন

ছাত্রজীবনে, খুবই ছেলেবেলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু সেদিন নানা বাধাবিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের গান শিখতে হয়েছে, করতে হয়েছে। আজ উপযুক্ত সঙ্গীত-শিক্ষকের অভাব নেই, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তন কয়েকটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত আজ জনপ্রিয় তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীর অভাব নেই, সঙ্গীতানুরাগী শ্রোতা রয়েছেন অসংখ্য, কিন্তু এই গান শোনানো এবং শোনার বাইরে আর একটা সমস্যা আছে যার সমাধান খুব সহজসাধ্য নয়। সেটা হলো যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিরাট ভাণ্ডারকে সঠিক ভাবে কি উপায়ে জানা যায়! রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গান একটির পর একটি শিখে শেষ করা সম্ভব নয় এবং সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে রবীন্দ্র-নাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনাকে পরিবেশন করে এর সঠিক পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। দু'দশটি, এমনকি দু'একশ গান শুনিয়েও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় দান করা সম্ভবপর নয়। আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রথমে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলনে"র প্রথম অধিবেশনের সময়, যেদিন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত জনসাধারণের পরিচয়দানের দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেখা গেল যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সতেরোটি বৈশিষ্ট্যসম্মত ধারার মাধ্যমে তুলনামূলক ভাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীতসৃষ্টির পরিচয় দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে একটি

ধারার অন্তর্গত সঙ্গীত-রচনাকে কেন্দ্র করে বারোটি আলোচনামূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে এ সম্পর্কে সঙ্গীতানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যে ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে সম্পদ দিয়ে গেছেন, তার বিনিময়ে আমরা কতটুকু কর্তব্য সম্পাদন করেছি— একথা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই বহুলপ্রসারের মধ্যেও সঙ্গীত পরিবেশনে যে সব অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, অজ্ঞতাই হলো তার প্রধান কারণ। সঙ্গীত-শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েরই এই সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব আছে— শিল্পীদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে আরো শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, বৈশিষ্ট্যসম্মত সঙ্গীত-পরিবেশনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য প্রচার করতে হবে, আর যথাযথ জ্ঞান সঞ্চয়ন করে সঙ্গীতানুরাগীদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। এই দ্বিবিধ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি এই বই লেখার কাজে হাত দিয়েছি, কতটা সফল হব জানিনা। তবে এই জাতীয় সম্পদের প্রতি কর্তব্যবোধেই এই পরিশ্রম, এবং ভবিষ্যতের ফলাফলের উপরেই এর সার্থকতা নির্ভর করবে।

একজন সঙ্গীত-শিল্পীর প্রাথমিক জীবনে নানা প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা থাকলে এবং সামান্য তাললয়ের দখল থাকলেই বেতারে, রেকর্ডে গান গাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়না— যার ফলে শিক্ষা বা জ্ঞান সঞ্চয়নের স্পৃহা আর থাকে না, আসে আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ফলে শিল্পবোধহীন শিল্পী সৃষ্টি হল, পরিশ্রম ও সময়সাধ্য শিল্পসাধনার আর অবকাশ রইলনা— যে অভ্যাস আত্ম-হত্যারই সামিল। অপ্রিয় হলেও কথাগুলি সত্য এবং আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি নিজেও এই প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছি এবং

মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই আমরাও এই সব প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইনি এমন নয়। কিন্তু যে ভাবেই হোক আমাদের সংযত হয়ে এই মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করতে হবে, নইলে সঙ্গীতরূপ শিল্পকলার প্রধান আদর্শই ক্ষুন্ন হবে। এটা সতর্কবাণী নয়, ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে এই আমার অনুরোধ।

আজ আমার মনে পড়ে স্বর্গত সুজিত রঞ্জন রায়ের কথা, যার সঙ্গে ছেলেবেলায় একত্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুশীলন করেছি এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার স্বপ্ন দেখেছি। আজ অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু সঙ্গীত-ক্ষেত্রে আমার নিত্যসঙ্গী সুজিতের সঙ্গে সেদিন নেহাৎ সখের খাতিরেই যে শিল্পকলার চর্চ্চা সুরু করেছিলাম আজ তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। আজ সুজিত নেই, কিন্তু যে দায়িত্ব ছেলেবেলায় আমরা একত্রে গ্রহণ করেছিলাম, নানা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তা সম্পাদন করে চলেছি। এই বই রচনা সেই সব পরিকল্পিত কার্য্যক্রমের অংশস্বরূপ, তাই সুজিতের অভাব আজ বেশী করেই মনে লাগছে। আমার সহকর্ম্মী স্বর্গতা সেবা মিত্রকে আজ স্মরণ করি, যিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই আমাদের আদর্শ প্রচারের কাজে সহায়তা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত শান্তিনিকেতনের ধারার নৃত্যকলার প্রচারে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

এই বই রচনায় শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী', শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত', অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সুর ও সঙ্গতি' এবং শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণী-সঙ্গম' থেকে আমাকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, তাই আমি তাঁদের কাছে ঋণী। শ্রীসুবিনয় রায়,

শ্রীসুনীলকুমার রায়, শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। রাগবিশ্লেষণ কার্য্যে শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীসোমেন্দ্র নাথ গুপ্তর ঐকান্তিক আগ্রহেই এ বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছে—এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৯
৩৮, বালীগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা-১৯

শুভ গুহঠাকুরতা

প্রকাশকের বক্তব্য

আজকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চাহিদা বাড়ার মূলে রয়েছে রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্র-কৃষ্টির প্রতি জনসাধারণের ক্রমঘনিষ্ঠ আগ্রহ। যে সঙ্গীত সম্পদকে, মাত্র এক যুগ আগেও, পাঁচমিশেলী বাংলা গানের মতো "আধুনিক" বলে লোকে মনে করতো, যার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের রস উপভোগ করবার জন্য জনসাধারণ আগ্রহ নিয়ে সেদিন পর্য্যন্ত এগিয়ে আসেন নি—সেই গান নিয়ে আজ যে এত মাতামাতি, এটা সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। বাঙ্গালীর যে রুচি বোধ জাগ্‌ছে—এটাই তার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসৃষ্টির আদর্শকে বুঝতে হলে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন ধারাগত বৈশিষ্ট্য—উভয়কেই জান্‌তে হবে, নয়তো বহুল প্রসারের মধ্যেও রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে অনেক অসঙ্গতি থাকার সম্ভাবনাটাই বড়ো হয়ে দাঁড়াবে, যার ফলে শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েরই লোকসান হতে পারে প্রচুর।

যেসব বিষয় জানবার ব্যাঘাত নানা কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সাম্‌নে এসে সাধারণতঃ উপস্থিত হয়, লেখক, বিশেষ যত্নের সঙ্গে সেইসব বিষয়গুলিকে সহজ ও সরল বিশ্লেষণ করে—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক সত্ত্বাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়ে সঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষার্থীমহলের সামনে ফুটিয়ে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

লেখকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি জগতে, বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও, ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সেবক, শিল্পী বা অধ্যাপক বলেই নয়, একজন কৃতি সংগঠক এবং উৎসাহী কর্ম্মী বলেও এঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

'দক্ষিণী' প্রকাশন বিভাগের সুরু হোল এই বইটী দিয়ে। ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগ থেকে লেখক কর্ত্তৃক এই নামেই যে ধারাবাহিক মাসিক বেতারানুষ্ঠানগুলি পরিবেশিত হয়েছিল, তারই উপর ভিত্তি করে এই বইটী রচিত। নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ করা হঠাৎ ঠিক হওয়াতে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে। সেই কারণে ও অনভিজ্ঞতাজনিত এবং অন্যান্য কারণে ভুলত্রুটী থেকে যাচ্ছে। সেজন্য সকলের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে দয়া করে শুদ্ধিপত্র অনুযায়ী ভুলগুলি সংশোধন করে যেন বইটী পাঠ করা হয়। ভুলত্রুটী সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য যত্নবান থাকবো— এটুকু আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেকে আমায় নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীঅজয় হোম আদ্যপান্ত প্রুফ্ সংশোধনে আমার শ্রম অনেকখানি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, শ্রীসত্যজিৎ রায় বইটির মলাট এঁকে দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছেন, শ্রীদিলীপ গুপ্ত 'সিগনেট বুকশপে'র তরফ থেকে বইটির পরিবেশনার ভার গ্রহণ করেছেন, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ 'ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে'র পক্ষ থেকে অতি অল্পসময়ে বইখানি ছাপাবার দায়িত্ব নিয়েছেন—এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রসপিপাসু ছাত্রছাত্রীমহলে, কবিগুরুর গুণগ্রাহীদের এবং সঙ্গীতানুরাগী সর্ব্বসাধারণের কাছে বইখানি সমাদর লাভ করলে আমরা উৎসাহিত হবো। ইতি

৮ই মে, ১৯৫২
'দক্ষিণী' প্রকাশন বিভাগ
১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এই বিরাট ভাণ্ডার আবার এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে সমগ্রভাবে ও যথাযথভাবে জানা একরকম দুঃসাধ্য। এই সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির মধ্যে ১৭টি ধারা প্রবহমান এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন ধারানুযায়ী পর্য্যালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টির ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়--কতগুলি গান আছে যা হলো সুরধর্ম্মী আর অন্যগুলি হলো কাব্যধর্ম্মী। সুরধর্ম্মী রচনায় সুরবিন্যাসের আদর্শেই কাব্যাংশকে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কাব্যধর্ম্মী রচনার আদর্শ হলো কাব্যাংশের প্রয়োজনে সুরবিন্যাস। রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রবহমান এই সতেরোটি বিভিন্ন ধারার মধ্যে কতকগুলি হলো সুরধর্ম্মী—যেমন রাগসঙ্গীত, ধ্রুপদ, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি এবং সেই সব গানকেই এই সব ধারার অন্তর্গত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে সুপরিচিত বিভিন্ন পর্য্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, উদ্দীপনার গান, প্রেমসঙ্গীত, ঋতুসঙ্গীত, হাস্যরসাত্মক গান ইত্যাদি যে সব ধারার সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে কাব্যাংশই প্রধানতম এবং কাব্যাংশের আদর্শই রক্ষিত

হয়েছে এই সব ধারার রচনায়। এই ভাবে বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য নয়, কেননা কাব্যাংশ ও সুর-সংযোজনার বিচারে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানকেই দুই পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে— ধ্রুপদ জাতীয় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাই কাব্যাংশের বিচারে ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্গত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ রচনার বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যাধিক্যের জন্য তাদের একটি স্বতন্ত্র ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদাঙ্গ গান ছাড়াও বহুবিধ রচনা স্থান পেয়েছে, সেই কারণে আদর্শগত মিল থাকলেও এই সব ধরণের রচনার একটা বিশেষ স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। কাব্যধর্ম্মী রচনার অন্তর্গত ঋতুসঙ্গীতের অনেক রচনাই রাগসঙ্গীত পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে সব ধারা কাব্যধর্ম্মী, নানা সুরের রচনা তার মধ্যে স্থান পেয়েছে, কাজেই ভারতীয় সঙ্গীতের সুপরিচিত কয়েকটি পর্য্যায়ের রচনার স্বাতন্ত্র্য এসব ক্ষেত্রে রক্ষিত হওয়াই শ্রেয়। বাউলের সুরের গান অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্গত কিন্তু ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যে বহুবিধ সুরের রচনা পাওয়া যায়, তাই লোকসঙ্গীতের সুপরিচিত সুরগুলির স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা দানের জন্য এগুলিকে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করা যুক্তিসম্মত। কাব্যাংশের বিচারে পর্য্যায়ভুক্ত না করে ভারতীয় সঙ্গীতের সুপরিচিত সুরের গানগুলিকে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করবার প্রয়োজন অন্যভাবেও আছে, এর পরে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের ৬১ বছরের সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে গঠনবৈচিত্র্যের বিবেচনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর বা যুগ প্রবহমান। যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনা ১৮৭৭।৭৮ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে—আমরা ১৮৮১ সাল থেকে তাঁর রচনা আরম্ভ হয়েছে ধরে নেব, কেননা এই সময় থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা ক্রমপর্য্যায় করা সম্ভব, এর পূর্ব্বেকার রচনা বিক্ষিপ্ত এবং সংখ্যায়ও খুব অল্প। ১৮৮১ থেকে ১৯০০ পর্য্যন্ত সময়কালকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ কাল। সেই সময় ঠাকুর পরিবারে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল খুব বেশী—এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল। ছেলেবেলায় যে গান সর্ব্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনাআপনি জমে উঠেছিল।" রবীন্দ্রনাথ বাল্যজীবনে বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রমুখ সে যুগের প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিল্পীদের সংসর্গে এসেছিলেন, কাজেই সেই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যজীবনে যে সব গান রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

গান, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, অন্যান্য প্রাদেশিক সঙ্গীত ইত্যাদির সুর অবলম্বন করে সৃষ্ট হয়েছিল। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রচনা একেবারে ছিল না এ কথা বলা যায় না এবং স্বতন্ত্র রচনার সংখ্যাও খুব কম নয়, তবু সুরবিন্যাসের আদর্শে এই প্রথম যুগের রচনা উপরোক্ত বিভিন্ন পর্য্যায়ের গানের সুরে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম যুগের রচনার মধ্যে সুরবিন্যাসের আদর্শই রক্ষিত হয়েছে, একথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না।

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ মধ্যযুগে ভিন্নরূপ এক পরীক্ষা চলেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিতে। ১৯০০—১৯২০ সালের অন্তবর্ত্তী সময়কালকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যযুগ বলা যায়—এই সময়কালের রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করলেন মাত্র অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কেবল কাঠামোটি বজায় রেখে আতিশয্য ও অলঙ্কার-বাহুল্যকে বর্জ্জন করলেন এই মধ্যযুগের রচনার মধ্যে, গানের কাব্যাংশ যেখানে সুরকে প্রভাবিত করতে সুরু করেছে। "সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"আমাদের দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত ও অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কতগুলি সুরসমষ্টির কর্দ্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই"।

সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় এই মধ্যযুগের রচনার মধ্যে। সুর-যোজনা নিয়ে পরীক্ষা চলেছিল এই সময়কালের মধ্যে এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরবর্ত্তীকালের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই মধ্যযুগেই। এই মধ্যযুগে রচিত হলো 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি, সুরবিন্যাসের আদর্শে যেগুলি প্রথম যুগের ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা থেকে স্বতন্ত্র, সেগুলি পূর্ব্বের নায় সুরধর্ম্মী নয়, এদের অধিকাংশই হলো কাব্যের বাহন। কবিতায় যে ছন্দ থাকে গানে তার প্রয়োগ সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করলেন ১৯১৭ সালে রচিত এবং 'গীত-পঞ্চাশিকা' স্বরলিপি পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "দুয়ার মোর পথপাশে", "ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল", "ব্যাকুল বকুলের ফুলে" এবং "কাঁপিছে দেহলতা থরথর" এই চারটি গানের মধ্যে। কবিতা হিসাবে এই কয়টি রচনা আবৃত্তি করলে যে ছন্দ আসে, গানের মধ্যে সেই ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি গানের প্রতিটি পংক্তি এক একটি তালে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই সব বিভিন্ন পরীক্ষামূলক রচনা পর্য্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে এই মধ্যযুগে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনার মধ্যে বিজাতীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠে নিজস্ব সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত

করতে চেষ্টিত হয়েছেন। হিন্দুস্থানী গান ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার সময়কাল যদিও ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তবু মধ্যযুগের ও পরবর্ত্তীকালে এই পর্য্যায়ের রচনা সংখ্যায় অল্প এবং এই সময়কালের অন্যান্য ধারার রচনার উপর এর কোনো প্রভাব নেই। ঝম্পক, ষষ্ঠি, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক, এই ছয়টি নূতন তাল সৃষ্ট হয়েছে এই মধ্যযুগেই, কাজেই একথা প্রমাণিত হয় যে এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সৃজন-প্রতিভার বিকাশের পথে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ-গুলিকে মর্য্যাদাদান করেন নি এবং প্রয়োজনবোধে অনেক অশাস্ত্রীয় পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন নিজস্ব সৃষ্টির প্রেরণায়। তাল ও ছন্দ সম্পর্কে এই সব অশাস্ত্রীয় পরীক্ষার কথা ১৯১৭ সালের ‘সবুজপত্রে’ প্রকাশিত “সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করেছেন এবং আপনার মতামত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন—“আমরা শাসন মানব, তাই বলে অত্যাচার মানব না। কেননা যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাইরের জিনিস নয়, তা বিশ্বের বলেই তা আমার আপনার। যে নিয়ম ওস্তাদের তা আমার ভিতরে নেই, বাইরে আছে সুতরাং তাকে অভ্যাস করে বা ভয় করে বা দায়ে পড়ে মানতে হয়। এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই

মানা থেকে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকবে।”

১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী একুশ বছর হল রবীন্দ্র সঙ্গীতের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ শেষ যুগ। এই সময়কালের রচনার মধ্যে আমরা পেলাম রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরূপকে, যে সব সঙ্গীত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবীতে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই স্তরের রচনায় রবীন্দ্রনাথ মাটির প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন করলেন,—যে রচনায় ওস্তাদীর চেয়ে অনুভূতিই হলো প্রধান—যে সঙ্গীতে রাগরাগিণী ও কাব্যরসের হলো গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। এই শেষের দিকের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য, তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন······আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর—তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যই।······গান রচনায় আমি কি করেছি, কোন পথে গেছি, গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে। বড়ো বড়ো বাগানওয়ালাদের কীর্ত্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না।” রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই তৃতীয় স্তরের সঙ্গীত-রচনা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে,

সেগুলি বিজাতীয় সঙ্গীতের প্রভাবমুক্ত। ১৯২৫ সালের পাঁচটি হিন্দি-ভাঙ্গা রচনা এবং ১৯৩১ সালে রচিত কয়েকটি দক্ষিণী সুরের গান ছাড়া আলোচ্য সময়কালের রচনার মধ্যে অন্যান্য সঙ্গীতের সুর নিয়ে রচনা আর পাওয়া যায় না। এই সময় আমরা পেলাম খুব সহজ সুর আর সিধে তালের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাগমিশ্রণের প্রয়াস। পরিণত বয়সে, নানা পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার শেষে, যে সব সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন এই তৃতীয় স্তরের অন্তবর্ত্তী সময়কালে, তাই হলো প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসম্মত রবীন্দ্র-সঙ্গীত। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই সব গানই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই তৃতীয় স্তরে আর একটি নূতন অধ্যায় সূচিত হয়েছে, যেরূপ প্রচেষ্টার পরিচয় বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর পাওয়া যায়নি, তা হলো বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় সাধন। গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই রচনা করে এসেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেও কয়েকটি গীতিকার গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একটি গল্পাংশকে পরিবেশন করে নৃত্যের মাধ্যমে তার যে ব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা,' 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের মধ্যে, বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরূপ প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব। 'বাল্মিকী-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদি কয়েকটি গীতিনাট্যে নৃত্যের ব্যবহার করা হয়েছে, তবে

তা সঙ্গীতাংশেরই প্রয়োজনে, আর নৃত্যনাট্যের মধ্যে নৃত্যের ছন্দকে রূপায়িত করাই হল সঙ্গীতের ধর্ম্ম। নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা স্থানান্তরে করা হয়েছে কাজেই এখানে এই সম্পর্কে অধিক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি কয়েকটি ধারার রচনাকাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার একেবারে আদি যুগ থেকে শেষ সময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সব ধারার রচনার মধ্যে ধর্ম্মসঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, ঋতু সঙ্গীত ইত্যাদি কাব্যধর্ম্মী রচনার মধ্যে আমরা নানাবিধ সুর-যোজনার মিশ্রণ দেখতে পাই। পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি যুগে এই সব পর্য্যায়ভুক্ত রচনার সুর-বিন্যাসের আদর্শ ভিন্নতর—এর মধ্যে একটি ধারার রচনা সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা আমরা তিনটি স্তরের মধ্যেই পাই, অথচ দেখা যায় যে এই ধারার গানের সুরবিন্যাসের আদর্শ তিনটি যুগেই স্বতন্ত্র ও অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত পন্থী। প্রথম যুগের ধর্ম্মসঙ্গীত রচনার অধিকাংশই রাগসম্মত এবং তাললয়ের বিচারেও সেগুলি প্রকৃত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্য্যায়ের—আর সে সময় পাওয়া গেল পশ্চাত্য সুর ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি, যেগুলির সুর দেওয়া হয়েছিল সে যুগের সঙ্গীতিক আবহাওয়ার উপযুক্ত করে। মধ্যযুগের অন্তর্বর্ত্তী 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য' ও

'গীতাঞ্জলি'র গানে এবং স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনার মধ্যে যে সুর-যোজনার আদর্শের পরিচয় পাই তার মধ্যে রাগরাগিণীর অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়না, কিন্তু সেগুলি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত নয়। শেষ যুগের যে সব ধর্ম্মসঙ্গীত পাওয়া যায় তার মধ্যে শাস্ত্রগত বিধানের কোনো স্বীকৃতিই নেই, এবং রাগরাগিণীর স্বাতন্ত্র রক্ষিত হয়নি। বহু রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে, সহজ সুর ও তালের সাহায্যে সুর-সংযোজনাই হলো এই যুগের সঙ্গীত-সৃষ্টির আদর্শ। কাব্যধর্ম্মী অন্যান্য ধারার মধ্যেও আমরা এই তিনটি স্তরের ভিন্নতর গঠনবৈচিত্র্যের পরিচয় পাই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিবেশ ও রুচির প্রয়োজনে যে আঙ্গিক পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাই, বিস্তৃতভাবে ও ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করলে সে সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে ১৮৮১ সালের পূর্ব্বে রচিত কয়েকটি রবীন্দ্র-

সঙ্গীত-রচনার ৬১ বছর

সঙ্গীত পাওয়া গেলেও, এই বছর থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার ধারাবাহিক আলোচনা সম্ভবপর। এর পরে প্রতি বছরের সঙ্গীত-রচনা পর্য্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের প্রায় আড়াই হাজার সঙ্গীত-রচনাকে সমগ্রভাবে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয় এবং অনেক

গানের রচনাকালও জানা যায় না, কাজেই প্রতি বছরের বিশিষ্ট ও নির্বাচিত কয়েকটি গানের যে তালিকা দেওয়া হল তা আদর্শগত ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে।

১৮৮১ সালের পূর্ব্বেকার রচনা—রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান, তবে নিম্নোক্ত গান কয়টি তাঁর প্রাচীনতম রচনার অন্তর্গত—

১। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

২। নীরব রজনী দেখ

৩। খুলে দে তরণী

৪। জ্বল জ্বল চিতা

উপরোক্ত গান কয়টি ছাড়াও 'হিন্দুমেলা'র যুগে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ১৩।১৪ বছর বয়সের সময় রচিত হয়েছিল এই তিনটি গান—

১। তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ

২। একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি

৩। একসূত্রে বাঁধা আছি

১৮৭৮ সালে পাওয়া গেল—

১। আঁধার শাখা উজল করি

২। শুন নলিনী খোল গো আঁখি

৩। বলি ও আমার গোলাপ বালা,—ইত্যাদি গানগুলি।

১৫।১৬ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭৬।৭৭ সালে বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন

এ কথা জানা যায়। ১৮৭৭ সাল থেকেই 'ভানুসিংহের পদাবলী'র গান রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়, কিন্তু এই পর্যায়ভুক্ত গানে সুর দেওয়া হয়েছিল পরবর্ত্তী কালে।

১৮৮১—এই বছর "বাল্মিকী প্রতিভা"র অন্তর্গত গানগুলি রচিত হয়।

১৮৮২—এই বছর রচিত হলো "কাল-মৃগয়া" গীতিনাট্য। এই নাটকটির অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথ পরে "বাল্মিকী প্রতিভা"র সঙ্গে মিশাইয়াছিলেন সেইজন্য এই নাটকের অনেক গানই এখন "বাল্মিকী-প্রতিভা"য় স্থান পেয়েছে। এই বছরের স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে "তুজনে দেখা হল" গানটি উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৩—এই বছর যে গানগুলি রচিত হলো, তার মধ্যে নিম্নোক্ত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য—

১। সারা বরষ দেখিনে মা (স্বদেশী)
২। মনে রয়ে'গেল মনের কথা (প্রেম-সঙ্গীত)
৩। হেদে গো নন্দ রাণী (শিশু-সঙ্গীত)

১৮৮৪—রবীন্দ্রনাথের এই বছরের রচনার মধ্যে এই কয়টি গানের উল্লেখ করা যায়—

১। আমার প্রাণের পরে চ'লে গেল (প্রেম-সঙ্গীত)
২। বুঝি বেলা বয়ে যায় "
৩। মরি লো মরি আমায় "
৪। বনে এমন ফুল ফুটেছে "

১৮৮৫—এই বছরের রচনার সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে শোনা যায় যে ১৮৭৫ সালের 'ফুলবালা'র অন্তর্গত "গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে" কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এই বছর সুর দিয়েছিলেন। এই বছরের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" কবিতায় সুর দেন রবীন্দ্রনাথ। স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে এই গানটি উল্লেখযোগ্য—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক (স্বদেশী)

১৮৮৬—এই বছর সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল হিন্দুস্থানী গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা। এ বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গান কয়টির উল্লেখ করা যায়—

১। প্রভাতে বিমল আনন্দে (হিন্দি-ভাঙ্গা)
২। সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি
৩। কখন বসন্ত গেল (প্রেম-সঙ্গীত)
৪। নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৫। ওগো শোন কে বাজায় (প্রেম-সঙ্গীত)
৬। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (স্বদেশী)
৭। ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে (প্রেম-সঙ্গীত)
৮। আগে চল, আগে চল (স্বদেশী)
৯। তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ (স্বদেশী)

১৮৮৭—এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য—

১। আবার মোরে পাগল করে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

২। তুমি আপনি জাগাও মোরে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৩। তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ "
৪। নাথ হে প্রেমপথে "
৫। তবু মনে রেখ (প্রেম-সঙ্গীত)

১৮৮৮—এই বছরের বিশিষ্ট রচনা হলো "মায়ার-খেলা"র অন্তর্ভুক্ত গানগুলি। স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গানটি উল্লেখযোগ্য—

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৮৮৯—যদিও "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" এবং "আমরা মিলেছি আজ" এই দুটি লোকসঙ্গীতের সুরের গান আমরা ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি, তবু প্রকৃত বাউল সুরের রচনা পাওয়া গেল এই বছর "বিসর্জ্জনের" একটি গানে। "রাজা ও রাণী"র অন্তর্গত গানগুলিও এ বছরের রচনা। এই বছরের কয়েকটি রচনা—

১। আমারে কে নিবি ভাই (বাউল)
২। এরা পরকে আপন করে (প্রেম-সঙ্গীত)
৩। সখী, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে (প্রেম-সঙ্গীত)

১৮৯০—এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বছরের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হলো কবিতা রচনায়, আর মধ্য ভাগে তিনি বিদেশ যাত্রা করলেন।

১৮৯১—এই বছর রবীন্দ্রনাথের বস্তুতঃ সাহিত্য-সাধনায় কেটে যায়, সঙ্গীত-রচনার কোনো প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৮৯২—এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গানগুলি অন্যতম—

১। আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে (স্বদেশী)
২। তোমরা হাসিয়া বহিয়া (প্রেম-সঙ্গীত)
৩। খাঁচার পাখী ছিল (কাব্য-সঙ্গীত)
৪। যার অদৃষ্টে যেমনি জোটে (প্রেম-সঙ্গীত)

১৮৯৩—এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত গান দুইটি উল্লেখযোগ্য—

১। আজি যে রজনী যায় (প্রেম-সঙ্গীত)
২। যদি জোটে রোজ (হাস্যরসাত্মক)

১৮৯৪—১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনা সংখ্যায় খুবই অল্প। বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে এই পাঁচ বছর তাঁর প্রধানতঃ কেটেছিল সাহিত্য-রচনায়। এই বছরের একটি বিশিষ্ট রচনা হলো—

১। আমার পরাণ লয়ে কি খেলা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৮৯৫—নিম্নোক্ত দু'টী গান এই বছরের রচনা—

১। বাজিল কাহার বীণা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। বড়ো বিস্ময় লাগে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৮৯৬—বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায়। হিন্দি-ভাঙ্গা ও মহীশূরী ভজনের সুরের বহুসংখ্যক রচনা পাওয়া যায় এই বছরে। স্বতন্ত্র সঙ্গীত রচনার সংখ্যাও যথেষ্ট। এই বছরে রচিত কয়েকটি গান—

১। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (মহীশূরী সুর)
২। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ ,,
৩। চির বন্ধু চির নির্ভয় ,,
৪। হৃদয় নন্দন বনে [illegible] ঙ্গা—রাগসঙ্গীত)
৫। আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে (হিন্দিভাঙ্গা—রাগসঙ্গীত)
৬। এ পরবাসে রবে কে (হিন্দিভাঙ্গা—টপ্পা)
৭। আজি বহিছে বসন্ত পবন (হিন্দিভাঙ্গা—ধ্রুপদ)
৮। ওহে জীবন বল্লভ (আখরযুক্ত—কীর্ত্তন)
৯। এস হে গৃহ দেবতা (আনুষ্ঠানিক)
১০। অন্ধজনে দেহ আলো (ধর্ম্ম সঙ্গীত)
১১। কেন বাজাও কাঁকন (প্রেম-সঙ্গীত)

১৮৯৭—এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য—

১। সুধা সাগর তীরে (হিন্দিভাঙ্গা—ধামার)
২। বেঁধেছ প্রেমের পাশে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৩। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী (স্বদেশী)
৪। সুখে থেকো আর (আনুষ্ঠানিক—বিবাহ)

৫। সখি প্রতিদিন চায় (প্রেম-সঙ্গীত)
৬। আমি কেবলি স্বপন „
৭। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা „

১৮৯৮—রবীন্দ্রনাথের এই বছরের সঙ্গীত রচনা খুবই কম। এই বছরের একটি রচনার উল্লেখ করা যায়—

হেরিয়া শ্যামল ঘন (প্রেম-সঙ্গীত)

১৮৯৯—এই বছরের রচনার সংখ্যাও খুবই কম। এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গান দুইটি উল্লেখযোগ্য—

১। ভয় হতে তব (ধ্রুপদ)
২। জানি হে যবে প্রভাত হবে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯০০—এই বছরের রচনার মধ্যে কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্গীত পাওয়া যায়—

১। তোমার পতাকা যারে দাও (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে „
৩। যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার „

১৯০১—এই বছরের রচনার মধ্যে রাগসম্মত ধর্ম্মসঙ্গীত রচনাই প্রধান। নিম্নোক্ত গানগুলি এ বছরের রচনা—

১। মোরা সত্যের পরে মন (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী „
৩। অল্প লইয়া থাকি „
৪। জীবনে আমার যত আনন্দ „
৫। সকল গর্ব্ব দূর করি দিব (ধ্রুপদ)

১৯০২—এই বছরের রচনাও কেবলমাত্র ধর্ম্মসঙ্গীত পর্য্যায়ভুক্ত। তার মধ্যে নিম্নলিখিত গানগুলি উল্লেখযোগ্য—

১। মোরে ডাকি লয়ে যাও (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। বল দাও মোরে বল দাও ”
৩। সফল করহে প্রভু ”
৪। আমি কী বলে করিব নিবেদন (রাগ-সঙ্গীত)

১৯০৩—এই বছরে রচনার মধ্যে পাওয়া যায় হিন্দিভাঙ্গা ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা পর্য্যায়ের গান। রবীন্দ্রনাথ যে ছয়টি নূতন তাল সৃষ্টি করেছেন, তার কয়েকটি তালের সঙ্গীত রচনা সর্বপ্রথম পাওয়া গেল এই বছরে। উপরোক্ত পর্য্যায়ের গান ছাড়াও স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে ধর্ম্মসঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত ও স্বদেশী-সঙ্গীত পর্য্যায়ভুক্ত গান পাওয়া যায়—

১। বাজাও তুমি কবি (হিন্দিভাঙ্গা—ধ্রুপদ)
২। বাণী তব ধায় অনন্ত ” ”
৩। সুন্দর বহে আনন্দ ” ”
৪। পান্থ এখনো কেন (হিন্দিভাঙ্গা—খেয়াল)
৫। বিমল আনন্দে জাগোরে ” ”
৬। মন্দিরে মম কে ” ”
৭। কে বসিলে আজি (হিন্দিভাঙ্গা—টপ্পা)
৮। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো ” ”

৯। সুখহীন নিশিদিন (হিন্দি তেলেনার সুরে)
১০। গভীর রজনী নামিল (নূতন তালের গান—রূপকড়া)
১১। নিবিড় ঘন আঁধারে (নূতন তালের গান—নবতাল)
১২। দুয়ারে দাও মোরে (নূতন তালের গান—একাদশী)
১৩। আনন্দ তুমি স্বামী (রাগ-সঙ্গীত)
১৪। ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে (রাগ-সঙ্গীত)
১৫। জননীর দ্বারে আজি ঐ (স্বদেশী)
১৬। আমার প্রাণের মানুষ (লোক-সঙ্গীত)

১৯০৪—এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি গান উল্লেখযোগ্য—

১। আমি চঞ্চল হে (প্রেম-সঙ্গীত)
২। মহাবিশ্বে মহাকাশে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯০৫—স্বদেশী-সঙ্গীতই হলো এই বছরের রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে এবছর যে স্বাদেশিকতার বন্যা এসেছিল তার মধ্যে রচিত হলো—

১। এবার তোর মরা গাঙে (স্বদেশী)
২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ ,,
৩। আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে ,,
৪। আজি তুই পরের দ্বারে ,,
৫। ছি ছি চোখের জলে ,,
৬। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক ,,

৭। যে তোরে পাগল বলে (স্বদেশী)
৮। ওরে তোরা নেই বা কথা বল্‌লি „
৯। যদি তোর ভাবনা থাকে „
১০। আপনি অবশ হলি „
১১। বাংলার মাটি বাংলার জল „
১২। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে „
১৩। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি „
১৪। জোনাকি, কি সুখে ঐ (কাব্য-সঙ্গীত)

১৯০৬—এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা অপেক্ষাকৃত কম, তার মধ্যে এই দুইটি গান উল্লেখযোগ্য—

১। আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। কত অজানারে জানাইলে তুমি

১৯০৭—এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য—

১। তব সিংহাসনের আসন হতে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে „
৩। আমার মাথা নত করে দাও „
৪। বিপদে মোরে রক্ষা করো „
৫। অন্তর মম বিকশিত করো „
৬। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)
৭। আমার নয়ন ভুলানো এলে (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)



১৯০৮—বহুসংখ্যক এবং বহুবিধ রচনা পাওয়া যায় এই বছরে। হিন্দিভাঙ্গা পর্য্যায়ের বহু রচনা ছাড়াও, ঋতু-সঙ্গীত, স্বদেশী-সঙ্গীত, ধর্ম্মসঙ্গীত এবং অন্যান্য পর্য্যায়ের বহু গান রচিত হয়েছে এই বছরে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি উল্লেখযোগ্য—'শারদোৎসব' গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত বহু গানও এই বছরের রচনা।

১। আঁখি জল মুছাইলে জননী (হিন্দিভাঙ্গা—খেয়াল)
২। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ ,, ,,
৩। প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল ,, ,,
৪। এ ভারতে রাখ (হিন্দিভাঙ্গা—ধ্রুপদ)
৫। বীণা বাজাও হে (হিন্দিভাঙ্গা—ধামার)
৬। আজ ধানের ক্ষেতে (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)
৭। আনন্দেরি সাগর হতে (উদ্দীপনার গান)
৮। তোমার সোনার থালায় (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৯। আজি ঝড়ের রাতে ,,
১০। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)
১১। মেঘের পরে মেঘ জমেছে (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
১২। যে তরণীখানি ভাসালে (আনুষ্ঠানিক—বিবাহ)
১৩। বাজে বাজে রম্য বীণা (পাঞ্জাবী ভজনের সুর)
১৪। জননী তোমার করুণ চরণখানি (নূতন তালের গান-নবপঞ্চক)
১৫। ও আমার দেশের মাটি (স্বদেশী)
১৬। আমরা পথে পথে যাব

১৯০৯—এই বছরে বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত বহু রচনা ছাড়াও পাওয়া যায় "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের অন্তর্গত বহু গান। নিম্নলিখিত গানগুলি এই বছরের রচনার অন্তর্ভুক্ত—

১। রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। তুমি কেমন করে গান করো ,,
৩। আমার মিলন লাগি তুমি ,,
৪। এই যে তোমার প্রেম ওগো ,,
৫। একটি নমস্কারে প্রভু ,,
৬। আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে ,,
৭। ঐ আসন তলের মাটির পরে (লোক-সঙ্গীত—কীর্ত্তন)
৮। প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত ,, ,,
৯। শরতে আজ কোন অতিথি (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)
১০। আজ প্রথম ফুলের ,, ,,
১১। আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
১২। আজ বারি ঝরে ঝরঝর ,, ,,

১৯১০—বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত বহু বিশিষ্ট রচনা এই বছরে পাওয়া যায়। "রাজা" নাটকের অন্তর্ভুক্ত গানগুলিও এ বছরের রচনা। এ বছরের অন্যান্য রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি অন্যতম—

১। বিশ্ব যখন নিদ্রামগন (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। সবার আলো জ্বালাতে চাই ,,
৩। যেথায় থাকে সবার অধম ,,
৪। সীমার মাঝে অসীম তুমি ,,

৫। এবার নীরব করে দাও হে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৬। জীবন যখন শুকায়ে যায়
৭। আমারে যদি জাগালে আজি (নূতন তালের গান—ঝম্পক)
৮। বসন্তে কি শুধু কেবল (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)
৯। আজি দখিন দুয়ার খোলা " "
১০। বিরহ মধুর হল আজি (প্রেম-সঙ্গীত)
১১। আমি রূপে তোমায় ভুলাব না "
১২। ঐ রে তরী দিল খুলে (নূতন তালের গান—রূপকড়া)
১৩। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ (লোক-সঙ্গীত—কীর্ত্তন)
১৪। হে মোর চিত্ত (স্বদেশী)
১৫। আবার এসেছে আষাঢ় (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
১৬। নদী পারের এই আষাঢ়ের " "
১৭। আজি কমলমুকুলদল খুলিল (হিন্দিভাঙ্গা—খেয়াল)
১৮। ডাকে বার বার ডাকে " "
১৯। রাখো রাখোরে জীবনে " "

১৯১১—এই বছরের বিশিষ্ট রচনার মধ্যে "অচলায়তন" নাটকের অন্তর্ভুক্ত গানগুলি উল্লেখযোগ্য। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন" এই বছর মাঘোৎসবের জন্য রচিত হয়েছিল। এই বছরের কয়েকটি গান—

১। যিনি সকল কাজের কাজী (উদ্দীপনার গান)
২। সকল জনম ভরে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৩। আমরা চাষ করি আনন্দে (আনুষ্ঠানিক—হলকর্ষণ)
৪। আলো আমার আলো ওগো (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৫। উতল ধারা বাদল ঝরে (ঋতু-সঙ্গীত)

৬। সব কাজে হাত লাগাই মোরা (উদ্দীপনার গান)

৭। ঘরেতে ভ্রমর এলো (প্রেম-সঙ্গীত)

৮। তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৯। ও অকূলের কূল (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১০। জনগণমন অধিনায়ক (স্বদেশী)

১৯১২—এই বছর থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার অধিকাংশই 'গীতিমাল্যে'র অন্তর্ভুক্ত গান। এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা—

১। তুমি একটু কেবল বসতে দিও (প্রেম-সঙ্গীত)

২। পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৩। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে „

৪। আজিকে এই সকাল বেলাতে „

৫। এমনি করে ঘুরিব „

৬। এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে „

৭। ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো (প্রেম-সঙ্গীত)

৮। সময় কারো যে নাই (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯১৩—'গীতিমাল্যে'র অন্তর্ভুক্ত বহু রচনা ছাড়াও এই বছর হিন্দিভাঙ্গা পর্য্যায়ের বহু বিশিষ্ট গান পাওয়া যায়। এ বছরের কয়েকটি গান—

১। যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

২। যে রাতে মোর দুয়ার গুলি „

৩। যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৪। আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ,,
৫। অসীম ধনতো আছে ,,
৬। আমাদের যাত্রা হলো শুরু ,,
৭। আমাদের শন্তিনিকেতন (আনুষ্ঠানিক)
৮। কার মিলন চাও বিরহী (হিন্দিভাঙ্গা—খেয়াল)
৯। জয় তব বিচিত্র আনন্দ ,, ,,
১০। জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত ,, ,,
১১। তিমিরময় নিবিড় নিশা ,, ,,
১২। প্রথম আদি তব শক্তি (হিন্দিভাঙ্গা—ধ্রুপদ)
১৩। জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে (হিন্দিভাঙ্গা—ধামার)

১৯১৪—এ বছরের প্রথমদিকের রচনাগুলি 'গীতিমাল্যে'র অন্তর্ভুক্ত। ঠিক তার পরেই এই বছরে রচিত হলো 'গীতালি'র ১০৮টি গান, বাংলা ১৩২১ সালের শ্রাবণ থেকে ৩রা কার্ত্তিকের মধ্যে, অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে। এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা—

১। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে ,,
৩। এই লভিনু সঙ্গ তব ,,
৪। মোর সন্ধ্যায় তুমি ,,
৫। এই তো তোমার আলোক ধেনু ,,
৬। তার অন্ত নাই গো ,,
৭। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ,,

৮। মেঘ বলেছে যাব যাব (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৯। শরৎ তোমার অরুণ আলোর (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)

১০। তোমার খোলা হাওয়া (লোক-সঙ্গীত—ভাটিয়াল)

১১। হৃদয় আমার প্রকাশ হলো (নূতন তালের গান, ষষ্ঠী, ৪+২)

১২। এই শরৎ আলোর কমল বনে (নূতন তালের গান—রূপকড়া)

১৩। আমারে দিই তোমার হাতে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯১৫—এ বছরের উল্লেখযোগ্য রচনা "ফাল্গুনী" গীতিনাট্যের ২৯টি গান। কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা—

১। ওগো দখিন হাওয়া (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)

২। চোখের আলোয় দেখেছিলেম (প্রেম-সঙ্গীত)

৩। ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৪। বসন্তে ফুল গাঁথল (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)

৫। সবাই যারে সব দিতেছে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৬। হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে (উদ্দীপনার গান)

৭। ছাড়্‌গো তোরা ছাড়্‌গো (ঋতু-সঙ্গীত—শীত)

৮। ভালোমানুষ নইরে মোরা (হাস্যরসাত্মক)

৯। তোমার সুরের ধারা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯১৬—১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত রচিত গানগুলি 'গীত-পঞ্চাশিকা' স্বরলিপি পুস্তকে স্থান পেয়েছে। নিম্নোক্ত কয়টি গান এবছরের উল্লেখযোগ্য রচনা—

১। ওহে সুন্দর মরি মরি (প্রেম-সঙ্গীত)

২। কান্না হাসির দোল দোলানো (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৩। কেনরে এই দুয়ার টুকু (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৪। আমার সকল দুখের প্রদীপ ,,

৫। কবে তুমি আসবে বলে (প্রেম-সঙ্গীত)

১৯১৭—এ বছরে 'গীত-পঞ্চাশিকার' অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গান পাওয়া যায়, ছন্দ বৈচিত্র্যে যা অপূর্ব। এই বছর "সঙ্গীতের-মুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত-রচনার মধ্যে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নোক্ত কয়েকটি গান এ বছরের রচনার অন্তর্ভুক্ত—

১। ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

২। এই তো ভাল লেগেছিল (লোক-সঙ্গীত—বাউল)

৩। সে কোন বনের হরিণ (কাব্য-সঙ্গীত)

৪। দুয়ার মোর পথপাশে (নূতন তালের গান—নবতাল, একত্রে ৯ মাত্রা)

৫। ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল (প্রেম-সঙ্গীত—৫+৫ ছন্দ)

৬। ব্যাকুল বকুলের ফুলে (নূতন তালের গান—নবতাল, ৫+৪ ছন্দ)

৭। কাঁপিছে দেহলতা থরথর (নূতন তালের গান—একাদশী, ৩+৪+৪ ছন্দ)

১৯১৮—এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি উল্লেখযোগ্য—

১। আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

২। আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে ,,

৩। কোন সুদূর হতে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৪। দেশ দেশ নন্দিত করি (স্বদেশী-সঙ্গীত)
৫। নিশিদিন মোর পরাণে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৬। পথে চলে যেতে যেতে "
৭। রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে "
৮। মন, জাগো মঙ্গললোকে (হিন্দিভাঙ্গা-খেয়াল)

১৯১৯—১৯১৯ সালে, বাংলা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে, রচিত হলো "গীতি-বীথিকা"র অন্তর্ভুক্ত ২১টি গান। "রাজা" নাটকটি পরিবর্ত্তিত করে এই বছরে রচিত হলো "অরূপ-রতন" রূপক-নাট্য—যার মধ্যেও অনেক নূতন গান পাওয়া যায়। এই বছর রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে রচিত কয়েকটি কবিতায় সুর-সংযোজনা করেন। এই বছরের কয়েকটি রচনা—

১। আকাশ জুড়ে শুনিনু (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় (কাব্য-সঙ্গীত)
৩। গানের ভিতর দিয়ে যখন (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৪। আমি তোমায় যত "
৫। কূল থেকে মোর গানের তরী "
৬। আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে "
৭। ঐ বুঝি কালবৈশাখী (উদ্দীপনার গান)
৮। আমি যখন ছিলেম অন্ধ (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৯। আমরা সবাই রাজা (উদ্দীপনার গান)

১০। ওগো পথের সাথী (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১১। এ শুধু অলস মায়া ('কড়ি ও কোমল'—কাব্য-সঙ্গীত)

১২। কে আমারে যেন ('মানসী'—কাব্য-সঙ্গীত)

১৩। আমার গোধুলি লগন ('খেয়া'—কাব্য-সঙ্গীত)

১৯২০—এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত গানটি এই বছরের রচনা—

পাখী আমার নীড়ের পাখী (কাব্য-সঙ্গীত)

১৯২১—যে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান আজ খুবই জনপ্রিয়, তার প্রবর্ত্তন করেন রবীন্দ্রনাথ এই বছর জোড়াসাঁকোয়, ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর। এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-রচনা—

১। আমারে ডাক দিল কে (লোকসঙ্গীত)

২। কেন যে মন ভোলে (প্রেম-সঙ্গীত)

৩। হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী (ঋতু-সঙ্গীত—হেমন্ত)

৪। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন (ঋতু-সঙ্গীত—শীত)

৫। দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯২২—এই বছর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটককে পরিবর্ত্তিত করে "মুক্তধারা" নাটক রচিত হলো। তার মধ্যে কয়েকটি নূতন গান পাওয়া গেল। এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা—

১। অগ্নিশিখা এসো এসো (আনুষ্ঠানিক)

২। ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী (ঋতু সঙ্গীত—বসন্ত)

৩। আমি কান পেতে রই (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৪। জয় হোক, জয় হোক (উদ্দীপনার গান)

৫। তোমার সুরের ধারা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৬। নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র (আনুষ্ঠানিক—শিল্পোৎসব)

৭। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল (উদ্দীপনার গান)

৮। ফিরে চল মাটির টানে (আনুষ্ঠানিক—হলকর্ষণ)

৯। এস এস হে তৃষ্ণার জল (আনুষ্ঠানিক—শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন উপলক্ষে রচিত)

১৯২৩—এই বছরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হলো "বসন্ত" গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত গানগুলি। এই বছরের "রক্তকরবী" নাটকের অন্তর্গত কয়েকটি নূতন গানও পাওয়া গেল। এই বছরের কয়েকটি রচনা—

১। দখিন হাওয়া জাগো জাগো (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)

২। সে কি ভাবে গোপন রবে " "

৩। যদি তারে নাই চিনিগো " "

৪। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে (ঋতু-সঙ্গীত—শীত)

৫। ও চাঁদ চোখের জলের (প্রেম-সঙ্গীত)

৬। ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে "

৭। দুই হাতে কালের মন্দিরা যে (শিশু-সঙ্গীত—বাংলা বর্ষশেষের দিন রচিত)

১৯২৪—এই বছরের জুলাই মাস পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাপানে। দেশে ফিরে এসে দুমাস পরে আবার যাত্রা

করলেন দক্ষিণ আমেরিকা ও ইতালি ভ্রমণে। এই কারণে এই বছর সঙ্গীত-রচনার বিশেষ অবকাশ ছিল না। এই বছর জাপান থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে একটি 'চা-চক্র' প্রবর্ত্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই উপলক্ষ্যে রচনা—

চাস্পৃহ চঞ্চল, চাতক দল চলো হে

১৯২৫—হিন্দিভাঙ্গা পর্য্যায়ের সর্ব্বশেষ পাঁচটি সঙ্গীত রচনা পাওয়া গেল এই বছরে। "গৃহপ্রবেশ" নাটকের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি নূতন গানও পাওয়া যায় এই বছরে। এই বছরের কয়েকটি রচনা—

১। অশ্রুভরা বেদনা (হিন্দিভাঙ্গা—খেয়াল)
২। এসো শরতের অমল মহিমা " "
৩। কার বাঁশী নিশিভোরে " "
৪। কোথা যে উধাও হলো " "
৫। বন্ধু রহ রহ সাথে " "
৬। হে ক্ষণিকের অতিথি (প্রেম-সঙ্গীত)
৭। আমার রাত পোহালো (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)
৮। এবার অবগুণ্ঠন খোলো (প্রেম-সঙ্গীত)
৯। এসো নীপবনে ছায়া বীথিতলে "
১০। ওলো শেফালি ওগো শেফালি (ঋতু-সঙ্গীত—শরৎ)
১১। বাজোরে বাঁশরী বাজো (প্রেম-সঙ্গীত)
১২। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯২৬—এই বছরে রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক এবং বহুবিধ রচনা পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র সঙ্গীত রচনা ছাড়াও 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ' 'নটীর পূজা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটকের অন্তর্ভুক্ত গানগুলি এ বছরের রচনা। এ বছরের কয়েকটি গান—

১। এসো এসো প্রাণের উৎসবে (প্রেম-সঙ্গীত)
২। জ্বলেনি আলো অন্ধকারে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৩। নিশীথে কী কয়ে গেল (প্রেম-সঙ্গীত)
৪। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে (ঋতু-সঙ্গীত—শীত)
৫। শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৬। আর রেখোনা আঁধারে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৭। পথে যেতে ডেকেছিলে ,,
৮। হে মহাজীবন ,,

১৯২৭—এই বছর মার্চ্চ মাসে রচিত 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' পালাগানের অন্তর্গত গানগুলি এ বছরের বিশিষ্ট রচনা। এই বছরের মধ্য থেকে শেষভাগ জাভা, সুমাত্রা, বালি ইত্যাদি স্থান ভ্রমণে কাটে, এই কারণে সে সময় সঙ্গীত রচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বছরের গান—

১। এসো এসো হে বৈশাখ (ঋতু-সঙ্গীত—গ্রীষ্ম)
২। কেন পান্থ এ চঞ্চলতা (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৩। গগনে গগনে আপনার মনে ,, ,,

৪। তপের তাপের বাঁধন কাটুক (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)

৫। নৃত্যের তালে তালে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৬। মধ্যদিনে যবে গান (ঋতু-সঙ্গীত—গ্রীষ্ম)

৭। মুখখানি করো মলিনবিধুর (প্রেম-সঙ্গীত)

৮। শীতের বনে কোন সে কঠিন (ঋতু-সঙ্গীত—শীত)

১৯২৮—এই বছরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার নিম্নলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য—

১। যাবার বেলা শেষ কথাটি (প্রেম-সঙ্গীত)

২। লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা ,,

৩। হায়রে ওরে যায়না কি জানা ,,

৪। তোমার আমার এই বিরহের (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৫। এবার মিলন হাওয়ায় (প্রেম-সঙ্গীত)

৬। কাছে যবে ছিল ,,

৭। জয় করে তবু ভয় কেন ,,

১৯২৯—'তপতী'র অন্তর্গত গানগুলি এ বছরের রচনা। নিম্নোক্ত গানগুলি এ বছরের রচনার অন্তর্ভুক্ত—

১। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে (প্রেম-সঙ্গীত)

২। তুমি বাহির থেকে দিলে (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

৩। তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ,,

৪। মন যে বলে চিনি (প্রেম-সঙ্গীত)

৫। আলোক চোরা লুকিয়ে এল (উদ্দীপনার গান)

৬। বকুল গন্ধে বন্যা এলো (প্রেম-সঙ্গীত)

৭। প্রলয় নাচন নাচলে যখন (উদ্দীপনার গান)
৮। দিনের পরে দিন যে গেল (প্রেম-সঙ্গীত)
৯। তোমার আসন শূন্য আজি (উদ্দীপনার গান)
১০। শুভ্র নব শঙ্খ তব (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

১৯৩০—রবীন্দ্রনাথের এই বছরের প্রথমভাগ দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে এবং পরে বিলাত ও রাশিয়া ভ্রমণে কাটে, তাই এই সময়কার সঙ্গীত-রচনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৯৩১—বহু বিচিত্র সঙ্গীত রচনা পাওয়া যায় এই বছরে। 'নবীন' নাটকের ২১টি গান এবং 'শাপমোচন' নাটকের বহু গান এই বছরের রচনার অন্তর্ভুক্ত। 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই বছর সুর দেন। দক্ষিণী-ভাঙ্গা গান কয়টিও এই বছর রচিত হয়েছে। এই বছরের কয়েকটি রচনা—

১। এসো আমার ঘরে এসো (প্রেম-সঙ্গীত)
২। ওকি এলো ওকি এলো না ,,
৩। ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)
৪। ওরে চিত্ররেখাডোরে (প্রেম-সঙ্গীত)
৫। তুমি কি কেবলি ছবি (কবিতা রচনা, ১৯১৪—প্রেম-সঙ্গীত)
৬। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে (ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)
৭। যখন মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি ,, ,,
৮। সখি আঁধারে একেলা ঘরে (প্রেম-সঙ্গীত)
৯। সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে ,,

১০। লহো লহো তুলে লহো (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
১১। বাসন্তী হে ভুবনমনোমোহিনী (মাদ্রাজী সুর)
১২। বাজে করুণ সুরে "
১৩। নীলাঞ্জনছায়া "
১৪। কখন দিলে পরায়ে (রাগ-সঙ্গীত—ঠুংরী)
১৫। বেদনা কী ভাষায় রে (মাদ্রাজী সুর)

১৯৩২—এ বছরের কিছু সময় রবীন্দ্রনাথের পুণা, পারস্য ও ইরাক ভ্রমণে কেটে যায়। অন্য সময় সাহিত্য ও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনায় কাটে—সঙ্গীত রচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৯৩৩—এই বছর বহুবিধ সঙ্গীত-রচনা পাওয়া যায়। পূর্ব্বরচিত 'মহুয়া'র কতগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই বছর সুর দেন। এ ছাড়া 'তাসের দেশে'র অন্তর্ভুক্ত গানগুলিও এ বছরের রচনা—

১। আজি এ নিরালা কুঞ্জে (রচনা, ১৯২৮—লোক-সঙ্গীত, কীর্ত্তন)
২। আমার নয়ন তব নয়নের (রচনা, ১৯২৮—প্রেম-সঙ্গীত)
৩। আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা (রচনা, ১৯২৮ ")
৪। আরো কিছুক্ষণ না হয় (রচনা, ১৯২৮ ")
৫। অজানা খনির নূতন মণির (রচনা, ১৯২৮ ")
৬। প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় (রচনা, ১৯২৮—ঋতু-সঙ্গীত —বসন্ত)
৭। বাহির পথে বিবাগী হিয়া (রচনা, ১৯২৮—প্রেম-সঙ্গীত)

৮। আমরা নূতন যৌবনেরি দূত (উদ্দীপনার গান)
৯। খর বায়ু বয় বেগে (লোক-সঙ্গীত—সারি)
১০। ওগো বধূ সুন্দরী (রচনা, ১৯২৪—প্রেম-সঙ্গীত)
১১। গোপন কথাটি রবেনা গোপনে (প্রেম-সঙ্গীত)
১২। না না, ডাকব না, ডাকব না (লোক-সঙ্গীত—বাউল)
১৩। আমি তোমার মাটির কন্যা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
১৪। হে নিরুপমা, হে নিরুপমা (রচনা, ১৯০০—প্রেম-সঙ্গীত)
১৫। হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
১৬। তোমায় সাজাব যতনে (প্রেম-সঙ্গীত)
১৭। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (উদ্দীপনার গান)
১৮। আমি তারেই জানি তারেই জানি (লোক-সঙ্গীত—বাউল)
১৯। বলো সখী বলো (প্রেম-সঙ্গীত)
২০। আমার মন বলে চাই ,,

১৯৩৪—এ বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গানগুলি উল্লেখযোগ্য—

১। মায়াবনবিহারিণী হরিণী (প্রেম-সঙ্গীত)
২। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা (উদ্দীপনার গান)
৩। পিনাকেতে লাগে টঙ্কার ,, ,,
৪। হে সখা বারতা পেয়েছি (প্রেম-সঙ্গীত)
৫। কোন গহন অরণ্যে তারে ,,
৬। দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠাল ,,
৭। না চাহিলে যারে পাওয়া যায় (লোক-সঙ্গীত—কীর্ত্তন)
৮। বঁধু কোন মায়া লাগল চোখে (প্রেম-সঙ্গীত)

১৯৩৫—এ বছরের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি রচনায় ও ভ্রমণে কাটে—"হৈ হৈ" সঙ্ঘের জন্য রচিত গানগুলি এ বছরের রচনার অন্তর্ভুক্ত—

১। কাঁটাবনবিহারিণী (হাস্যরসাত্মক)
২। না গান গাওয়ার দলরে মোরা „
৩। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে „
৪। জানি জানি তুমি এসেছো এ পথে (প্রেম-সঙ্গীত)
৫। নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে (রচনা, ১৯০০ ; ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৬। হৃদয় আমার নাচেরে „ „ „
৭। আজি বরিষণ মুখরিত (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)

১৯৩৬—এ বছরের রচনার অন্তর্গত হলো 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের গানগুলি। এ বছরের কয়েকটি গান—

১। মোহিনী মায়া এলো (প্রেম-সঙ্গীত)
২। ওরে ঝড় নেমে আয় (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৩। শুনি ক্ষণে মনে মনে (প্রেম-সঙ্গীত)
৪। রোদন ভরা এ বসন্ত „
৫। আমার এই রিক্ত ডালি „
৬। আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় „
৭। কেটেছে একেলা বিরহের বেলা „
৮। বিনা সাজে সাজি (লোক-সঙ্গীত—কীর্ত্তন)
৯। ভোর থেকে আজ (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)

১৯৩৭—এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বর্ষাসঙ্গীত—

১। আজি গোধূলি লগনে (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
২। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে (লোক-সঙ্গীত—বর্ষা)
৩। আমি তখন ছিলেম মগন (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৪। আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ "
৫। এসো শ্যামল সুন্দর (গৎ-ভাঙ্গা গান)
৬। ওগো আমার চির অচেনা (প্রেম-সঙ্গীত)
৭। গোধূলি গগনে মেঘে (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৮। চিনিলে না আমারে কি (প্রেম-সঙ্গীত)
৯। থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
১০। মধু গন্ধে ভরা " "
১১। মনে কি দ্বিধা রেখে (প্রেম-সঙ্গীত)
১২। মেঘ ছায়ে সজল বায়ে (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
১৩। শ্রাবণের পবনে আকুল " "

১৯৩৮—এই বছরের প্রথমভাগে রচিত "চণ্ডালিকা" ও শেষভাগে রচিত "শ্যামা" নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত রচনাই উল্লেখযোগ্য। এ বছরে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার-খেলা'কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই বছরের কয়টি রচনা—

১। ওগো ডেকোনা মোরে (প্রেম-সঙ্গীত)
২। ওগো কিশোর আজি (রচনা, ১৯২৬—প্রেম-সঙ্গীত)

৩। ফিরে যাও কেন (প্রেম-সঙ্গীত)
৪। জীবনে পরম লগন "
৫। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া "
৬। নীরবে থাকিস সখী "
৭। সব কিছু কেন নিলনা "
৮। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী "

১৯৩৯—পূর্ব্বের রচিত 'ডাকঘর' নাটকে কোনো গান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই বছর 'ডাকঘরে'র জন্য নূতন সাতটি গান রচনা করেন—

১। আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল
('ডাকঘর'—উদ্দীপনার গান)
২। বাহির হলেম আমি আপন ('ডাকঘর', ঋতু-সঙ্গীত—বসন্ত)
৩। শুনি ঐ রুনুঝুনু পায়ে ('ডাকঘর'—প্রেম-সঙ্গীত)
৪। এই তো ভরা হলো ফুলে ফুলে ('ডাকঘর'—প্রেম-সঙ্গীত)
৫। সুরের জালে কে জড়ালে ('ডাকঘর'—প্রেম-সঙ্গীত)
৬। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া ('ডাকঘর', লোক-সঙ্গীত—বাউল)
৭। সমুখে শান্তি পারাবার ('ডাকঘর'—ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
৮। এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে (প্রেম-সঙ্গীত)
৯। বসন্ত সে যায় তো হেসে (প্রেম-সঙ্গীত)
১০। আজি মেঘ কেটে গেছে "

১৯৪০—কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা পাওয়া যায় এই বছরে যার মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি অন্যতম—

১। এসেছিনু দ্বারে তব (প্রেম-সঙ্গীত)
২। এসেছিলে তবু আস নাই ,,
৩। এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও ,,
৪। ওগো তুমি পঞ্চদশী ,,
৫। ধূসর জীবনের গোধূলিতে ,,
৬। বাদল দিনের প্রথম কদমফুল (ঋতু-সঙ্গীত—বর্ষা)
৭। স্বপ্নে আমার মনে হলো ,, ,,
৮। নহ মাতা নহ কন্যা ('চিত্রা'—'উর্ব্বশী' কবিতা—কাব্য-সঙ্গীত)

১৯৪১—এই বছর ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। এই বছরের প্রথম থেকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য সঙ্গীত রচনায় সক্ষম হন নি, তারি মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে যে দুটি পূর্ব্বলিখিত কবিতায় সুর দেন, সে দুটিই হলো রবীন্দ্রনাথের শেষসঙ্গীত-রচনা, পূর্ব্বরচিত কবিতার অংশবিশেষ এই দুটি গানের কাব্যাংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে—

১। ঐ মহামানব আসে (বাংলা নব বর্ষের জন্য রচিত—ধর্ম্ম-সঙ্গীত)
২। হে নূতন দেখা দিক আরবার (জন্মদিনের জন্য রচিত—ধর্ম্ম-সঙ্গীত)

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আসবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—সেটি হল এই

যে, জনপ্রিয়তার তাগিদে রবীন্দ্রনাথের গান যে পদ্ধতিতে প্রচারিত হচ্ছে তার মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরূপ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে এ অতি আনন্দের কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান যেভাবে গীত হতে ভালবাসতেন সেই পরিবেশন প্রণালীর বদলে বর্ত্তমানের বহুল প্রসারের মধ্যে যে বিকৃত রস ও রুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাই কি সঙ্গীত-সমাজে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলে স্থায়ী আসন লাভ করবে? বর্ত্তমানের বিকৃত পরিবেশন-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে প্রতিষ্ঠা আসবে তাই দিয়েই কি রবীন্দ্রনাথের গানের গুণাগুণ বিচার হবে—না রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য এবং মহত্তর আদর্শ প্রচার করে আমরা একে প্রকৃত মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করব, এই হল রবীন্দ্র সঙ্গীতানুরাগীদের বিচার্য্য বিষয়। এ অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, বেতার প্রতিষ্ঠান, রেকর্ড কোম্পানী, ছায়াচিত্র কর্ত্তৃপক্ষ ইত্যাদি এ দেশের শক্তিশালী প্রচার-যন্ত্রগুলির কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও প্রকৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীর মর্য্যাদা আজও উপেক্ষিত। এদের উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে সঙ্গীত-শিল্পীরা কণ্ঠস্বরের মিষ্টতাকেই একমাত্র মূলধন করে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত গায়কী, অলঙ্করণ নীতি ইত্যাদির দখল পাওয়ার জন্য যথাযথ শিক্ষা-গ্রহণ ও সাধনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কোন বৈশিষ্ট্য

পরিবেশন প্রণালী

নেই—যে কোন শিল্পীর পক্ষে শিক্ষালাভ না করেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঠিক পরিবেশন করা সম্ভব নয়, এ কথা প্রমাণযোগ্য।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, আবার তা ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান ১৭টি বিভিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্যও সুপরিস্ফুট। সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের যে কোন ধারার সঙ্গীত সৃষ্টির পরিবেশনেই একটি স্বতন্ত্র গায়কী প্রকাশ পায়—আবার বাউল, কীর্ত্তন, ধ্রুপদ, টপ্পা ইত্যাদির বিভিন্ন ধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের গানের এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আর সেই সঙ্গে তার বিভিন্ন ধারা বা পদ্ধতির সঙ্গীত-রচনার বিভাগীয় বৈশিষ্ট্যের দখল পেতে হলে নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। স্বরলিপি বইতে প্রকাশিত সুর বজায় রেখে গাইলে সুরবিকৃতি না হওয়া সম্ভব, কিন্তু এইভাবে এইরূপ সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত গায়কী, সঠিক অলঙ্করণ নীতি ও মার্জ্জিত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে রসবিকৃতির অনেক নিন্দা, সমালোচনা হয়েছে—কিন্তু কোথায় এর ত্রুটি, আর কি করলে এই ত্রুটি শুধরে নেওয়া যায়, এ বিষয়ে কোনও নির্দ্দেশ পরিষ্কারভাবে দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে, এর সঠিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে স্বরলিপি বইতে প্রকাশিত সুর সংরক্ষণ করা ছাড়াও,

তাল-লয় সম্মত হলেও, অন্যান্য যে সব বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে—এর পরে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

অলঙ্করণ-নীতি—রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ, সে যুগে ধ্রুপদ ও টপ্পার ছিল বহুল প্রসার—তখনকার দিনের সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কণ্ঠে টপ্পা ও ধ্রুবপদ্ধতির গানের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ধ্রুপদ ও টপ্পার বৈশিষ্ট্য শিক্ষালাভ না করলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঠিক অলঙ্করণ নীতির দখল পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার সঙ্গীত রচনা, এবং তাঁর সমগ্র সঙ্গীত রচনার প্রায় অর্দ্ধাংশ প্রাচীন ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীতের অনুকরণে রচিত। রুচি ও যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণতাকে প্রশয় না দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ মিশ্র রাগের ব্যবহারে তাঁর গানে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন, কিন্তু অলঙ্করণ-নীতির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ধারার রচনায় রক্ষিত হয়েছে। ধ্রুপদ ও টপ্পার সংমিশ্রণে যে অলঙ্করণ তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ব্যবহার্য্য, এবং এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্করণ-নীতির প্রয়োগই তাঁর যে কোন সময়কার গানে চলে।

উচ্চারণ-প্রণালী—রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে কথার অংশের মূল্য বড়ো কম নয়, কিন্তু এই কাব্যাংশের উচ্চারণে যথেষ্ট পরিমাণে ত্রুটি শুনতে পাওয়া যায়। প্রথমে যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে বলা যাক্। সঙ্গীত পরিবেশনে

যুক্তাক্ষর উচ্চারণে ভুলটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সামান্য চেষ্টা করলেই এ ভুলটা শুধরে নেওয়া যায়, এবং তার ফলে সঙ্গীত-পরিবেশন উন্নততর ও মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন হতে পারে। একটা কথা ধরে নেওয়া যাক্—যেমন 'বন্ধন'। কথায় 'ন' ও 'ধ' যুক্তভাবে রয়েছে অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে—চার মাত্রায় এটি উচ্চারিত হয়, বন্ ০ ধন্ ০ এই ভাবে—যদিও হওয়া উচিত ছিল ব ০ ন্ধ ন্। প্রকাশিত স্বরলিপি বইয়েতেও এই ধরণের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে স্বরলিপিকারদের আর একটু যত্নবান হওয়া উচিত। রক্ত, ছন্দ, মুক্তি, আনন্দ, অন্ত ইত্যাদি যত যুক্তাক্ষর রবীন্দ্র সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে সবেরই উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য। কয়েকটি কথা আছে, যেমন—নাই, পাই, যাই ইত্যাদি। এগুলির উচ্চারণ করতে শোনা যায়—নাই ০ ০, পাই ০ ০, এই ভাবে—অথচ এদের সঠিক উচ্চারণ হওয়া উচিত না ০ ই, পা ০ ই, এই ছন্দে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিন অক্ষরে সম্পুর্ণ কথা, প্রথমের দুটি অক্ষর দ্রুত বলে শেষেরটি দেরী করে বলতে শোনা যায়, যেমন 'শরত তপনে'—স্বরলিপিতে হয়তো আছে তিনটি মাত্রায় তিনটি কথা, অথচ পরিবেশিত হলো—শর ০ ত তপ ০ নে, অর্থাৎ অনেকটা বিলিতি waltz এর ছন্দে। এতে শুধু উচ্চারণের বিকৃতি হয় না, ব্যাকরণেও ভুল হয়। ঐ—'ও' এবং 'ই' র, আর ঔ, 'ও' এবং 'উ' র সমষ্টি, এই দুইটি স্বরবর্ণ যে-কথায় ব্যবহৃত হয়েছে তার

উচ্চারণের সময়ে এই সমষ্টির বিশ্লেষণ যথাযথ ভাবে করতে হবে। "বৈশাখ" কথাটির উচ্চারণ সঙ্গীতে 'বো ই শাখ' হওয়া উচিত—'বৈ ০ শাখ' নয়। "মৌন" কথাটার উচ্চারণ মৌ ০ ন হবে না, 'মো উ ন' হওয়া উচিত। সাধারণ ক্ষেত্রে কী, কেন, যদি, তবু, ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবোধক কথাগুলি আমরা একটু জোরের সঙ্গে বলি, সঙ্গীতে এই কথাগুলি পরিবেশনের সময় কণ্ঠস্বর প্রবল করবার প্রয়োজন আছে। কয়েকটি কথা, যেমন যখন, মগন, নয়ন ইত্যাদি—কোনো কোনো শিল্পী "যখোন" "মগোন," "নয়োন" উচ্চারণ করেন, কিন্তু এই পদ্ধতিতে উচ্চারণ সুরুচি সম্পন্ন নয়। স্বরলিপির বইতে হসন্তের ব্যবহার সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ থাকে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে। হসন্তযুক্ত বর্ণ দিয়ে শেষ এমন অনেক কথার মাত্রাবিভাগ সম্পর্কে স্বরলিপির বইতে ত্রুটিপূর্ণ নির্দ্দেশ থাকে, শিল্পীদেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। ছয় মাত্রায় 'লগন্' কথাটির মাত্রা বিভাগ 'ল গ ০। ০ ০ ন্'। যে কোন কারণেই হোক্, হসন্তযুক্ত মাত্রাটি এর পূর্ব্বের কোনো মাত্রায় উচ্চারিত হওয়া বিধিসম্মত নয়। হসন্তযুক্ত বর্ণের পরের মাত্রায় যদি গানের কোনো বাণী না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সেই বর্ণটি তাল বা ফাঁকের শেষ মাত্রায় উচ্চারিত হবে, যেমন—'এ ০ ম্। নি ০ ০' কখনও 'এ ম্ ০। নি ০ ০' উচ্চারিত হলে শ্রুতিমধুর হয় না। 'য়' দিয়ে শেষ এমন কথা—যেমন হৃদয়, মলয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে —"য়" এর উচ্চারণে হসন্তেরও ব্যবহার হয় না অথচ এগুলি

অকারান্তও নয়। এসব ক্ষেত্রে "য়" ঈষৎভাবে হসন্ত ছুঁয়ে যাবে। কয়েকটি কথা, যেমন বসন্ত, হেমন্ত, ছন্দ,—এগুলি "বসন্তো", "হেমন্তো", "ছন্দো" বলে উচ্চারণ করা চলে না—আবার তীব্রভাবে 'অ'কারান্ত করলেও শ্রুতিকটু হয়। এই শব্দগুলি উচ্চারণ করবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে।

সঠিক শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতি—রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শ্বাসগ্রহণের বা দম নেবার একটা রীতি আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হলে সঠিক স্থানে শ্বাসগ্রহণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের ফলে গানের কথার অংশ এবং সঙ্গীতের রেশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। শ্বাসগ্রহণ দীর্ঘান্তরাল হলে শেষের দিকে কণ্ঠস্বর দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, আবার ঘন ঘন শ্বাসগ্রহণ করলে সঙ্গীতের সাবলীল গতি ক্ষুণ্ণ হয়। শ্বাসগ্রহণের শেষের দিকে গানের চড়ার সুরের অংশ পরিবেশন করা উচিত নয়, কেননা এই সময় কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক শক্তি থাকে না। কোনো কথা সম্পূর্ণভাবে পরিবেশন না করে, মধ্যস্থলে শ্বাসগ্রহণ করলে কথার অংশ অস্পষ্ট হয়। প্রায় সব গানেরই স্থানে স্থানে কয়েক মাত্রার বিরাম থাকে, এই সব স্থলে নতুন করে শ্বাস গ্রহণের জন্য একমাত্রা রেখে অন্য সব মাত্রায় পূর্ব্বস্বরের রেশ রেখে, সঙ্গীতের সাবলীল গতি বজায় রাখতে হবে। শ্বাস-গ্রহণের জন্য একমাত্রার বেশী সময় নেওয়া উচিত নয়। নিয়মিত ভাবে চর্চ্চা করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্বাসগ্রহণ বিশেষ

কষ্টকর হয় না। শ্বাসগ্রহণের ঠিক পরেই সঙ্গীতাংশের আরম্ভে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই প্রবল হয়, নিয়মিত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে এই ত্রুটি শুধরে নিতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের ফলে সঙ্গীতের পরিবেশনে যে চঞ্চলতা প্রকাশ পায় তা সঙ্গীত শিল্পীর দক্ষতা প্রমাণ করে না। অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের ফলে গানের লয় বা গতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, অনেক ক্ষেত্রে কথার অংশ বাদ গেছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন সাধন—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত গায়কীর দখল পেতে হলে সঙ্গীত-শিল্পীর নিজ কণ্ঠস্বরের উপর এমন প্রভাব রাখতে হবে যার ফলে সামান্য সময়ের মধ্যে প্রয়োজন মত কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বিশেষ করে চড়ার দিকের শুদ্ধ স্বর পরিবেশনে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর থেকে অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর হয়, আবার সঙ্গীতবিশেষে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অপেক্ষা প্রবল কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করবার রীতি আছে। স্বদেশী সঙ্গীত অথবা উদ্দীপনার গান পরিবেশনে কণ্ঠস্বরে যে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন, কাব্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা অপ্রয়োজনীয়, এবং এই ধারার সঙ্গীত পরিবেশনে কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধতার প্রয়োজন। মীড়-প্রধান গানে, কণ্ঠস্বরের এই তারতম্য সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করে। নিয়মিত চর্চ্চা করলে সঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠে তিন রকমের স্বরের দখল আসে—মৃদু, স্বাভাবিক ও প্রবল। সুষ্ঠু রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনের

জন্য এই তিন রকমের কণ্ঠস্বরের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। শুদ্ধ স্বর পরিবেশনে আমরা কণ্ঠস্বরের যে রূপ শুনতে পাই, কোমল স্বরের ব্যবহারে তার রূপ ভিন্নতর। একক সঙ্গীতে কণ্ঠস্বরের যে প্রয়োগ-রীতি দেখা যায়, সম্মেলক গানে তার স্বরূপ স্বতন্ত্র। রাগ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, কণ্ঠস্বরের তারতম্য সঙ্গীতের রস পরিবেশনে বিশেষ সহায়তা করে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের তাল ও ফাঁকের প্রথম মাত্রায় কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল হয়, ক্রমশঃ এই অভ্যাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসে এবং সঙ্গীত পরিবেশনে এই চঞ্চলতা আর প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বে স্বরলিপিকারদের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন সম্পর্কীয় নির্দ্দেশ থাকত, সরলা দেবী প্রণীত "শতগান" বইতে এইরূপ বর্ণনা আছে।

পূর্ব্বে যে কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুষ্ঠু পরিবেশন করতে হলে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের সজাগ থাকতে হবে। স্বরলিপি বইতে আনুষঙ্গিক সুর, পুনরাবৃত্তি, মীড়, মাত্রাবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কীয় যেসব নির্দ্দেশ থাকে সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। কম্পমান স্বরের অধিকারী যাঁরা, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করা সম্ভব নয়—কম্পমান স্বর কণ্ঠের দুর্ব্বলতা, যথোচিত চর্চ্চা থাকলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করলে কণ্ঠস্বরের এই দুর্ব্বলতাকে দূর করা যায়। এ কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে

অলঙ্কার-প্রাধান্য নিন্দনীয়। গানের লয় সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশ স্বরলিপি বইতে থাকে না—গানের কথা ও ভাবের প্রয়োজনেই গানের লয় নির্দ্ধারিত হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রায় সব রাগ-রাগিণী ও তালের প্রয়োগ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে, তাই প্রকৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী ও তাল-লয়ের জ্ঞান সঞ্চয়ন করতে হবে। সাধারণ জ্ঞান নিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করবার চেষ্টা চলতে থাকলে জনসাধারণকে এর বিকৃত রসেরই পরিচয় দেওয়া হবে। জাতীয় সম্পদ নিয়ে এই যে অবহেলা, এ আত্মপ্রবঞ্চনা নয় কি?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে আমরা আর একটা জিনিষ পেয়েছি, যার পরিচয় এ দেশের অন্যান্য গীতিকারদের রচনায় পাওয়া যায় না। এ হল ছন্দ-বৈচিত্র্য। এতো বিভিন্ন রকম ছন্দের ব্যবহার হয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে, যার প্রয়োগ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নি।

ছন্দ-বৈচিত্র্য

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ছন্দ-বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখন পর্য্যন্ত হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট নূতন তালের ছন্দ নিয়েই। রবীন্দ্রনাথ "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে ছন্দ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার অধিকাংশই নূতন তালের ছন্দকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে দাদ্‌রা, কার্ফা, তেওড়া ইত্যাদি

সহজতর তালের সঙ্গীত রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তালের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যাক্। তাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তাল জিনিষটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকারটা খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হোতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করতে হয়েছে কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব। ......তবু আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করেছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্তৃত্বের আসন কে পায়—মাঝ থেকে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।" হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাল বা ছন্দ রক্ষার প্রয়োজন হয়েছে দুটি কারণে—প্রধানতঃ সঙ্গীতের অবাধ গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতকে শ্রুতিমধুর করবার জন্য। সঙ্গীতের অবাধ গতি হতে পারে সেখানেই যেখানে গানের কথার অংশ খুব কম এবং প্রায় অপ্রয়োজনীয়, রাগবিন্যাসই হলো হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রধান আদর্শ। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছন্দ প্রয়োগে শ্রুতিমধুর

হয়েছে, তবে এর ক্ষেত্রে আর একটা সমস্যা এসে দেখা দেয়, যা হলো উচ্চারণ সমস্যা—যার অস্তিত্ব হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কয়েকটি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচনায়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বাঁধুনি বজায় রাখতে গিয়ে কাব্যাংশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত রচনার কয়েকটির ছন্দ দেওয়া হলো —

ধ্রুব পদ্ধতির একটি গান (চৌতাল)

II আ ০। মা০ রে। ক ০। রো০ ০০। ০ জী। ০ ব। ন ০। ০ দা। ০ন্ ইত্যাদি

একটি টপ্পা (আড়াঠেকা)

II এ কি ক রু। ণা ০ ০০০০ ০০। ০ ক০ ০০ রু। ণা ০ ০ ০। ০০ ০০০০ ম০ য়

একটি ধামার

বী ০ ০। ০ ০ ণা বা II জা ০ ০। ০ ০। ও ০। হে ০ ০। ০ম ম০ I অ ০ ন্। ত ০। রে ০।

একটি রাগ-সঙ্গীত (ত্রিতাল)

ডা II কে ০ ০ বা। র০ বা ০ র০। ডা ০ ০ ০। কে ০ ০ 'ডা' ইত্যাদি

উপরোক্ত গানগুলির সুর সংযোজনা এবং তালের ব্যবহার সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সঙ্গীতের বিভিন্ন

ধারাগত বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্করণ নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যই এইভাবে মাত্রার বিভাগ করা হয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অন্যান্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন উচ্চারণে স্পষ্টতা এবং সাবলীল গতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনায়, একটি তালের সম্পূর্ণতার শেষে গানের কথা অসম্পূর্ণ রেখেই অন্তরা বা সঞ্চারী আরম্ভ করবার নির্দ্দেশ আছে স্বরলিপির বইতে, যেমনটি হয়ে থাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে। তবে আজকালকার অনেক শিল্পী এই নির্দ্দেশ মানেন না এই কথা ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথের গানের কথার অংশের প্রাধান্য কম নয়। সঠিক সুর বজায় রেখে, উচ্চারণের বিকৃতি দূর করবার এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়।

স্বরলিপি বইতে কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত এমনভাবে বাঁধা রয়েছে যার উদ্ধার করতে গিয়ে ছন্দবিভ্রাটের জন্য উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবেই। একটি গান উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্—

'তিমিরময় নিবিড় নিশা' গানটির ছন্দ আছে, ঝাঁপতালে—তিমি। র ম য়। নি বি। ড় নি শা—
এই গানটির স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগ ঝাঁপতালের ছন্দে উচ্চারিত হলে গিয়ে দাঁড়ায়—তিমি। র ময়। নিবি। ড় নিশা ইত্যাদি। ঝম্পক তালে পরিবেশন করলে গানটির উচ্চারণে বিকৃতি হয় না, কিন্তু সঞ্চারিতে আবার ঝাঁপতালেই সুষ্ঠু পরিবেশন সম্ভব। কিন্তু সামান্য ভেবে দেখলেই ছন্দকে

সাবলীল করা যায় এবং উচ্চারণ বিকৃতি দূর করা যায়। ঝাঁপ-তালের ছন্দে তৃতীয় মাত্রায় যে স্বাভাবিক ঝোঁক আসে, কণ্ঠে এবং তবলার ঠেকায় তা প্রকট না করলেই এই অসুবিধা দূর করা যায়—অনেকটা পঞ্চমাত্রিক বা ১২৩৪৫। ১২৩৪৫, এই ছন্দে। 'শ্রাবণ মেঘের আধেক ত্বয়ার' গানটি স্বরলিপির বইতে আছে এই ছন্দে—

শ্রা ০ ব। ন্ মে ০। ঘে র্ আ। ০ ধে ক। ত্ব ০ য়া। র ঐ ০। খো ০ লা—এই গানটি দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। স্বরলিপিতে নির্দ্দিষ্ট দাদ্রা তালের ছন্দে এবং ফাঁকে ঝোঁক স্বাভাবিক রাখলে উচ্চারণ বিকৃত হতে বাধ্য। সঠিক স্থানে শ্বাসগ্রহণ না করলে এই গানের ছন্দ রক্ষায় একটা অস্বস্তিভাব থাকবে। 'আধেক' কথাটির 'আ', এবং 'ঐ'—এ ত্বটির উচ্চারণ প্রবলভাবে করলে পরিবেশন প্রণালী উচ্চতর হবে এবং ছন্দ সমস্যারও সমাধান হবে। এই গানটিতে 'আধেক' কথাটির 'আ' পর্য্যন্ত গেয়ে শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা হয় এবং তা করলে পরের কথা গিয়ে দাঁড়াল 'ধেক ত্বয়ার'—এতে শুধু উচ্চারণে বিকৃতি ঘটবে না, ছন্দে অসঙ্গতিও প্রকাশ পাবে। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির এবং সমধর্ম্মী অন্যান্য বহুগানের ছন্দের গতি লক্ষ্য করবার বিষয়। এই গানটির প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দ বিদ্যমান—তালের প্রথম মাত্রায় কথার উপর ঝোঁক আসে কিন্তু ফাঁকের প্রথম এক মাত্রা বাদ দিয়ে কথা আরম্ভ হয়। এই বিশিষ্ট ছন্দে অন্যান্য তালেও রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত-রচনা

দেখতে পাওয়া যায়। 'ধরা দিয়েছি গো' গানটির ছন্দ আছে—

ধ ০ রা। দি ০ য়ে। ছি ০ গো। ০ ০ ০

তাল ও ফাঁকের প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায় গানের কথা ঠিক এই ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত আছে। এই গানটির ছন্দ অনেকটা পাশ্চাত্য waltz ধরণের এবং আমাদের দাদ্‌রা তালে বাঁধা হলেও প্রতি তিন মাত্রায় একটি ছন্দ সম্পূর্ণ, তাই প্রত্যেক তিন মাত্রায় প্রথম কথাটির উচ্চারণ সামান্য প্রবল ভাবে করতে হবে। "কাল মৃগয়া" গীতিনাট্যের 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানটিও এই ছন্দে রচিত। ছন্দ-বৈচিত্র্যে এই সব গান বাংলা দেশের সঙ্গীত ক্ষেত্রে নূতনত্বের দাবী করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষায় ছন্দ নিয়ে যে সব পরীক্ষা করেছেন তার ফলে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধুর্য্য বেড়েছে। অচলিত ঝম্পক তালের 'আমারে যদি জাগালে' গানটি আছে—আমারে। য দি। জা গা লে। আ জি, এই ছন্দে। প্রচলিত ঝাঁপতালে গানটি গাইলে ছন্দ দাঁড়াত আমা। রে যদি। জাগা। লে আজি ইত্যাদি,—এই ধরণের ছন্দে গানের কাব্যাংশ বিকৃত হত। রূপকড়া তালের 'ঐ রে তরী দিল খুলে' গানটির মাত্রা বিভাগ হয়েছে—

ঐ ০ রে। ত ০। রী ০ ০। দি ০ ল। খু ০। লে ০ ০

এই আট মাত্রার রূপকড়া তালের গানটি যদি প্রচলিত আট মাত্রার তাল কার্ফায় গাওয়া হয় তবে গানের ভাব ও ছন্দ পতন ঘটবেই। এই নতুন তালের ছন্দ, এই গানটির সুরের

মধ্যে গানের প্রতিটি কথার স্বাতন্ত্র্য এনেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। 'হৃদয় আমার প্রকাশ হলো' এই গানটি ষষ্ঠীর বিপরীত অর্থাৎ ১২৩৪।১২ এই ছন্দে বাঁধা আছে—পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, দাদ্‌রা বা ষষ্ঠী অপেক্ষা এই নূতন ছন্দ গানটির পরিবেশন প্রণালী অনেক সহজ করে দিয়েছে।

'আমার যে সব দিতে হবে', 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়', 'আমার দোসর যে জন', 'কত যে তুমি মনোহর' ইত্যাদি দাদ্‌রা তালের গানে আমরা বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ দেখতে পাই। 'আমার যে সব দিতে হবে' গানটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাল ও ফাঁকের তৃতীয় মাত্রায় কোন কথা রাখা হয় নি। 'আমার দোসর যে জন' গানটিতে তালের দ্বিতীয় ও ফাঁকের তৃতীয় মাত্রায় কথা না বসিয়ে এক ভিন্নরূপ ছন্দের সমাবেশ ঘটেছে। 'কত যে তুমি মনোহর' গানটিতে তাল ও ফাঁকের দ্বিতীয় মাত্রায় কোন কথা না থাকায় আবার এক বিপরীত ছন্দ দেখতে পাই। 'হিমগিরি ফেলে' গানটি একত্রে ছয় মাত্রা সম্পূর্ণ করে গাইবার নির্দ্দেশ আছে স্বরলিপিতে—অর্থাৎ দাদ্‌রা তালের চতুর্থ মাত্রার ঝোঁক এড়িয়ে যেতে হবে। বাউল গানের বৈচিত্র্য বর্ত্তমান রাখতে 'মেঘের কোলে কোলে' গানটির অধিকাংশ স্থানে প্রতি লাইনে প্রথম কথাটিকে তালের একমাত্রা আগে বসানো হয়েছে—অর্থাৎ চলতি কথায়, গানটি শেষ পর্য্যন্ত আড়িতে চলেছে।

দাদ্‌রা তালের গানে যেরূপ বহুবিধ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, কার্ফা তালেও সেরূপ বহুবিধ পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গেই করা হয়েছে। কার্ফা তালের 'আমায় বাঁধবে যদি' গানের মধ্যে তালের ও ফাঁকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মাত্রায় কোনো কথা না থাকায় দ্বিমাত্রিক ছন্দ আসে, আবার 'সব দিবি কে' গানটির তাল ও ফাঁকের তৃতীয় মাত্রা খালি থাকায় ভিন্নরূপ এক ছন্দ প্রকাশ পায়। 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' গানটিতে তালের ও ফাঁকের দ্বিতীয় মাত্রায় কোনো কথা না থাকায় একটি বিপরীত ছন্দ প্রকাশ পায়। 'শীতের বনে কোন সে কঠিন' গানটির তালের পূরো চার মাত্রায় কথা বসানো হয়েছে কিন্তু ফাঁকের মাত্রাগুলি অধিকাংশই খালি, যার ফলে একটি নতুন ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাত মাত্রার তেওড়া তালের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আমরা বহুবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখতে পাই। 'আজি বহিছে বসন্ত পবন' গানটির কেবলমাত্র দ্বিতীয় মাত্রা খালি রেখে অন্য সব মাত্রায় কথা বসানো হয়েছে বলে এই গানটিতে শেষ পর্য্যন্ত একই ছন্দ বিদ্যমান। 'বিপুল তরঙ্গ রে' গানটিতে কেবলমাত্র পঞ্চম মাত্রা খালি রেখে অন্য সব মাত্রায় কথা বসানো হয়েছে বলে এর ছন্দ আবার ভিন্নরূপ। 'জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত' গানটিতে দ্বিতীয় ও পঞ্চম মাত্রা খালি রেখে অন্যান্য সব মাত্রায় গানের কথার অংশ থাকায় এই গানটিতে আবার নূতন ছন্দ দেখতে পাই। পূর্ব্বোক্ত তিনটি গানই হিন্দি-ভাঙ্গা

পর্য্যায়ের, কিন্তু আশ্চর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে সুর যোজনার ক্ষেত্রে মূলগানের সহিত এদের সুসাদৃশ্য থাকলেও —ছন্দের ক্ষেত্রে অনেক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় মূলগানের সহিত। 'সে যে পাশে এসে বসেছিল', 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর' ইত্যাদি গানে তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রায় কোনো কথা না থাকায় এই সব গানে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দ রক্ষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যে সব গান ত্রিতালে বাঁধা রয়েছে তার মধ্যে 'আঁখিজল মুছাইলে জননী' 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল', 'নব আনন্দে জাগো আজি' ইত্যাদি গানে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে প্রচলিত ছন্দের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান ; আবার যন্ত্রসঙ্গীতের গৎ-এ বাঁধা—'এসো শ্যামল সুন্দর,' 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো'—এই দুইটি গানের ছন্দ ভিন্নরূপ। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনা পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে—সুরফাক্তা, যৎ, মধ্যমান, আড়াঠেকা, চৌতাল, ধামার, রূপক, একতাল ইত্যাদি তালে যে সব ধ্রুপদ, টপ্পা, রাগসঙ্গীত পর্য্যায়ের গান আছে তাতে প্রাচীন রীতি ও নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার প্রচলিত ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে—ছন্দ-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে পাওয়া যায় দাদ্‌রা, কার্ফা, তেওড়া ইত্যাদি সহজতর তালের গানে, অর্থাৎ যে সব তালে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের অধিকাংশ মিশ্ররাগের গান রচিত।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এই যে বহুবিধ ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, এর প্রধান আদর্শ হলো গানের ভাবকে সুপরিস্ফুট করা। ১৮৮১ সালে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-পরিবেশনের আদর্শ সম্পর্কে যে-বক্তৃতায় নিম্নোক্ত কয়টি কথা বলেছিলেন, তাঁর জীবনব্যাপী সঙ্গীত-রচনার মধ্যে সেই আদর্শকেই মর্য্যাদা দিয়েছেন। বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, গানের আদর্শ—কথাকেই গানের সুর ও ছন্দ দ্বারা পরিস্ফুট করা। তিনি বলেছিলেন—"সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্ট শুনাক্ তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগ-রাগিণী আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি তাহা কেন হইবে? রাগ-রাগিণী আলাপ ভাষাহীন সঙ্গীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ, ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ করা, সঙ্গীতে আলাপও সেইরূপ। Pantomimeএ যেমন কেবল অঙ্গভঙ্গী হইলেই হয় না, যে সকল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে সকল সুর-বিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সঙ্গীতকে যে

আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সঙ্গীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" যদিও বিশ বছর বয়সের এই মতবাদ সঠিক নয় এ কথা তিনি পরবর্ত্তীকালে স্বীকার করেছিলেন, তবু এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কাব্যাংশকে প্রাধান্য দেবার যে আদর্শের কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সে আদর্শ তিনি দৃঢ়ভাবে শেষ সময় পর্য্যন্ত রক্ষা করে এসেছেন এবং কাব্যাংশের প্রয়োজনেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর ও ছন্দকে ব্যবহার করা হয়েছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর তৃতীয় যুগের অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীত-রচনার মধ্যে। কবিতায় আবৃত্তির যে ছন্দ আসে সঙ্গীত পরিবেশনে সে ছন্দ রক্ষা করা সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে, যার উল্লেখ করা হয়েছে পরে—"নূতন তালের গান" অধ্যায়ে। আবৃত্তির ছন্দ রক্ষার্থে সৃষ্ট নূতন তালের গান কয়টি ছাড়াও আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যার মধ্যে কবিতার ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে যেমন—

১। খরবায়ু বয় বেগে

২। হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু

৩। নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়

৪। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নৃত্যের ধারা ও রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীত পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। তাই আমরা গীতি-নাট্যের মধ্যে পাই নৃত্যের ব্যবহার, আর নৃত্য-নাট্যের মধ্যে সঙ্গীতই নিয়েছে গল্পাংশ ব্যঞ্জনার দায়িত্ব। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য রচনায় চেষ্টিত হয়েছিলেন, যে প্রচেষ্টার উৎসাহ এসেছিল পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্য থেকে। ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'বাল্মিকী-প্রতিভা' ও 'কাল মৃগয়া' গীতিনাট্য, কিন্তু তার পূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' এবং স্বর্ণকুমারী

গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য

দেবী রচিত 'বসন্ত-উৎসব' ঠাকুর পরিবারের সদস্যগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়েছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ কথাও জানা যায়। 'বাল্মিকী-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাল্মিকী-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।" 'বাল্মিকী-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' রচনার যুগে সে সময় শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের প্রচলন ও চর্চ্চা

ছিল খুবই বেশী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই বাংলা গানে ইয়োরোপীয় সুর-যোজনা নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও সবে প্রথমবার বিলেত থেকে ঘুরে এসেছেন, কাজেই এই দুইটি নাটকের পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব বেশ খানিকটা রয়েছে। পরিবেশন-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এই দুটি নাটকের অধিকাংশ গানই দেশীয় রাগ-রাগিণীতে রচিত, কিন্তু গাইবার পদ্ধতিতে একটা পাশ্চাত্য নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। কয়েক বছর পরে ১৮৮৮ সালে "মায়ার খেলা" গীতিনাট্যে আমরা এই পরিবেশনে কিছুটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। এই তিনটি গীতিনাট্যই "অপেরা" শ্রেণীর এবং পাশ্চাত্য "অপেরা"গুলির সঙ্গে এদের একটা মূলগত সাদৃশ্যও রয়েছে, অথচ এগুলির অধিকাংশ গানই ভারতীয় রাগ-রাগিণী অবলম্বনে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন একথা জানা যায় তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীত রচনায় এবং সুর-যোজনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি গীতিনাট্যের গানের সুসাদৃশ্য থেকেই বোঝা যায় যে এই সব গীতিনাট্য রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল।

'বাল্মিকী-প্রতিভা', 'কাল-মৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' এই কয়টি গীতিনাট্যই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা, তাই এই সব নাটকের গানে আমরা সে যুগের গায়ন পদ্ধতির পরিচয় পাই। এই সব নাটকে নৃত্যের ব্যবহার খুব কম নয়

অথচ এগুলিকে গীতিনাট্য বলা হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণই হলো এই যে, এই নাটক কয়টিতে গানের প্রয়োজনেই নৃত্যাংশকে ব্যবহার করা হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' এই তিনটি নৃত্যনাট্যই রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা, তাই এগুলির মধ্যে গীতিনাট্যের গানের সুরের মতো বিজাতীয় প্রভাব পাওয়া যায় না। এই তিনটি নাটককে নৃত্যনাট্য বলা হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণ হলো যে এই কয়টি নাটকের সঙ্গীতাংশ নৃত্যের বাঁধাধরা ছন্দের ভিত্তিতে রচিত। দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের—হয় একেবারে প্রথম জীবনে, নয়ত একেবারে শেষের দিকের রচনা, এর ফলে এই সব নাটকের গানগুলির মধ্যে আমরা দুইটি যুগের গায়নপদ্ধতি ও সুরযোজনার আদর্শের পরিচয় পাই। অন্যান্য ধারার মতো গীতিনাট্যের গানেও আমরা সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বহু হিন্দি-ভাঙ্গা ও পাশ্চাত্য সুরের গানের সমাবেশ দেখতে পাই, যার সাদৃশ্য একেবারেই নেই নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে, যেগুলি সমসাময়িক অন্যান্য ধারার মতো অধিকাংশই মিশ্র-রাগের ছন্দপ্রধান রচনা।

অন্তর্বর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে সব নাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে নৃত্যও আছে, সঙ্গীতাংশও কম নয়; কিন্তু অভিনয়াংশ থাকার জন্য এগুলিকে কাব্য-নাট্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সব নাটকের গানের সংখ্যাও কম নয়, এবং

বৈশিষ্ট্যের আদর্শেও এই সব গান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-ভাণ্ডারের বিশিষ্ট সম্পদ। বসন্ত, ফাল্গুনী, রাজা, অরূপ-রতন, শাপমোচন, নবীন, প্রায়শ্চিত্ত, তাসের দেশ, মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তকরবী, নটীর পূজা, তপতী ইত্যাদি নাটকের অন্তর্গত গানগুলি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট সম্পদ এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-ভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশ জুড়ে এরা রয়েছে। বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি ঋতুকালীন যে সব অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করেছেন, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত রচনার উৎসস্থল।

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নৃত্যধারা

নৃত্যকলা সম্পর্কে আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নৃত্যকলা সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন। আর পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত ও নৃত্যকলার মধ্যে একটা যোগসূত্র এনেছিলেন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে এবং বহু ক্ষেত্রেই এই দুইটি শিল্পকলা পারস্পরিক ভাবে নির্ভরশীল। নানা অনুষ্ঠানে নৃত্য-পরিবেশনের প্রয়োজনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচিত হয়েছে এবং সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার জন্য নৃত্যের ব্যবহার হয়েছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আজকাল এদেশে ভারত-নাট্যম্, কথাকলি, মনিপুরী ও কথক এই কয়টি নৃত্যধারার সমধিক প্রচলন দেখা যায়। অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এইরূপ একটি স্বতন্ত্র

নৃত্যধারার প্রচলন করেছেন কি? অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনো নৃত্যধারার সৃষ্টি করেন নি, তবে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার কি বৈশিষ্ট্য? ভারত-নাট্যমের সমধিক প্রচলন রবীন্দ্রনাথ জীবিতাবস্থায় দেখে যান নি, এটি ছাড়া পূর্ব্বোক্ত তিনটি নৃত্যধারার সমন্বয় সাধনই হলো রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব, এবং এই সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই তিনি নৃত্যকলার ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছেন। মণিপুরী নৃত্য হলো ভাবপ্রকাশের বাহক, বীর্য্য ও শক্তির প্রকাশের সুবিধা এর মধ্যে নেই। কথাকলির ধর্ম্ম হলো শক্তি ও তেজস্বিতার বিকাশ আর কথকের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দের ব্যঞ্জনা। এই তিনটি ধারারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভাবপ্রকাশে এদের নানারূপ অসুবিধাও আছে—রবীন্দ্রনাথ এই তিনটির সংমিশ্রণে যে নৃত্যধারার প্রচলন করেছেন তাকে এই তিনটির পরিপূরক নৃত্য হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৮ সালে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের পরিবেশনে ভারতের এই তিনটি নৃত্যধারার সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। এই নৃত্যনাট্যের 'বজ্রসেন' ও 'প্রহরীর' অভিনয় হয়েছিল কথাকলির পদ্ধতিতে, 'উত্তীয়' পরিবেশন করল কথক, আর 'শ্যামা' ও সখীর দল অভিনয় করল মণিপুরী নৃত্যকলার আদর্শে। এই সব বিভিন্ন নৃত্যধারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে বিশেষভাবেই মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হয়েছে তার প্রমাণও পাওয়া যায় যখন আমরা বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীদের দিয়েও এই সব ধারার

স্বতন্ত্র নৃত্য পরিবেশন প্রত্যক্ষ করি। সুরুচিসম্পন্ন সাজসজ্জা ও মঞ্চসজ্জাও এই সব সংস্কার সাধনে সহায়তা করেছে এবং শিক্ষিত সমাজে নৃত্যকে গ্রহণীয় করেছে। মণিপুরী নৃত্য-ধারাই সর্ব্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়, বোধ হয় 'নটীর পূজা'র সময়কালে, অর্থাৎ ১৯২৫।২৬ সালে। মণিপুরী ছাড়া কথাকলি পরবর্ত্তীকালে শান্তিনিকেতনে আপন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে এবং বর্ত্তমানে এই দুইটি নৃত্যধারাই সেখানে প্রচলিত।

সামাজিক উপাসনায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বেদমন্ত্রে সুর দিয়েছিলেন। বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মাঙ্গলিক সঙ্গীত হিসাবে এই সব গান গীত হয়ে থাকে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বেদগান গীত হবার রীতি এদেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু সেগুলির সাধারণতঃ সংস্কৃত উচ্চারণের মধ্যে সুর দিয়ে আবৃত্তি করাই রীতি ছিল। মন্ত্রপাঠকালে যে ছন্দ আসে, রবীন্দ্রনাথ সেই ছন্দের ভিত্তিতে রাগ-রাগিণীর সুরে এই সব বেদগানে সুর দিয়েছেন। যে কয়টি বেদমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন তার তালিকা দেওয়া হলো—

বেদগান

১। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (ইমন ভূপালী)

২। যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ণ ধ্মাতো—ঋগ্বেদ, ,,

৩। য আত্মদা বলদাযস্ত— ,, ,,

৪। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—ঋগ্বেদ (ভূপালি)

৫। সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম " "

৬। উষো বাজেন বাজিনী প্রচেতা—ঋগ্বেদ (ভৈরবী)

নিম্নোক্ত দুটি বেদমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন, কিন্তু সে সুর এখন হারিয়ে যাবার মতন হয়েছে—

১। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

২। ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি—ঋগ্বেদ

'তপতী' নাটকের তিনটি বেদমন্ত্রে ঠিক রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে সুর দেওয়া না হলেও রবীন্দ্রনাথ সেগুলিতে ভাবব্যঞ্জক সুর দিয়েছিলেন। সে তিনটি হলো—

১। উদু ত্যং জাতবেদসং— ঋগ্বেদ

২। বায়ুরনিলম্ মৃতমথেদং— ঈশোপনিষৎ

৩। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য— ঋগ্বেদ

উপরোক্ত বেদমন্ত্রগুলি ছাড়াও 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকের পাঁচটি পালি মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ রাগসম্মত সুর দিয়েছিলেন, সেগুলি হলো—

১। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—ভৈরবী

২। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং—কাফি

৩। নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়—বেহাগ

৪। নত্থিমে সরণং অঞ্ঞং—মিশ্র রামকেলি

৫। বুদ্ধ সুসুদ্ধো করুণা মহাণ্ণবো—" "

নিজস্ব রচনা ছাড়া অন্যান্য রচয়িতার যে কয়টি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। এর কয়েকটি গানের কথা পরে বিভিন্ন ধারার মধ্যে আলোচিত হলেও বিষয়গত সাদৃশ্যে এ কয়টি একত্রিত করে উল্লেখ করা হলো—

অন্যের রচনায় সুর যোজনা

১। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর" (বিদ্যাপতি)—মল্লার
২। "সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি" (গোবিন্দদাস)—ভৈরবী
৩। "মিলে সবে ভারত সন্তান" (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)—খাম্বাজ
৪। "বুঝতে নারি নারী কি চায়" (অক্ষয়কুমার বড়াল)—কাফি
৫। "বন্দেমাতরম্" (বঙ্কিমচন্দ্র)—দেশ
৬। "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে" (সুকুমার রায়)—বাউল
৭। "The bee is to come" (George Calderon)

রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত-রচনা রয়েছে যা রচিত হয়েছিল নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। স্বদেশী সঙ্গীত ও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত পর্য্যায়ের বহু রচনাও বিভিন্ন ঘটনা ও অনুষ্ঠানের জন্য রচিত হয়েছে, কিন্তু ঘটনাবলীর গুরুত্বে ও প্রয়োজনীয়তায় সেগুলিকে স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বতন্ত্র ধারার অন্তর্গত করে। সামান্য ছোটখাটো ও ক্ষণস্থায়ী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়টি রচনা রচিত হয়েছিল তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো—

বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংগীত রচনা

১। আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল

এ গানটি রচিত হয় ১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনের 'বর্ষামঙ্গলে'র সময় গলা ভেঙ্গে যাওয়ায়।

২। এসো এসো হে তৃষ্ণার জল

১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ গানটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন কার্য্যের সময়।

৩। দুই হাতে কালের মন্দিরা

১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনে, কাথিয়াবাড় ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ চাষী পরিবারের ১৩।১৪ বছরের যে-মেয়েটিকে সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন, তার নৃত্যপরিবেশন উপলক্ষ্যে রচিত।

৪। সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে

'তপতী' নাটকের এই গানটি রচিত হয় যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুর পরে।

৫। মরণ সাগরপারে তোমরা অমর

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

৬। কে যায় অমৃতধাম যাত্রী

এই গানটি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

৭। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

৮। কেনরে এই দুয়ারটুকু

কন্যার মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

৯। অনেক কথা যাও যে বলে

নন্দিনী দেবীর উচ্চারণ যখন অস্পষ্ট ছিল, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

১০। সে কোন বনের হরিণ

দিনেন্দ্রনাথের পোষা হরিণ পালিয়ে যাওয়ায় গানটি রচিত হয়।

১১। অগ্নিশিখা এসো এসো

১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনে, "গার্ল গাইডের" জন্য রচিত।

১২। সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান

১৯৩২ সালে, বাংলা ১৩৩৭ সনে, জাপানী যুযুৎসু পালোয়ান টাকাগাকীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসাবে রচিত।

১৩। বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গণ

বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েসনের অনুষ্ঠানের জন্য রচিত।

১৪। শান্তিমন্দির পুণ্য-অঙ্গন

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত।

১৫। বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান উপলক্ষ্যে ১৯৪০ সালে রচিত হয়।

১৬। পরবাসী চলে এসো ঘরে

১৭। এসো এসো প্রাণের উৎসবে

গান দুইটি ১৯২৬ সালে, বাংলা ১৩৩৩ সনে "প্রবাসী" পত্রিকার ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায়, "পরবাসী চলে এসো" কবিতাকে দুই ভাগে ভাগ করে সুর সংযোজিত হয়।

১৮। একলা বসে একে একে

অসিত কুমার হালদার মহাশয়ের ছবির ভাবার্থ বিশ্লেষণে রচিত হয়।

১৯। তুমি যে সুরের আগুন

অসিত কুমার হালদার মহাশয়ের অঙ্কিত "অগ্নিবীণা কোলে সরস্বতী" ছবি দেখে রচিত হয়।

২০। চলো যাই চলো

১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ট্রেনিং' কোরের কুচকাওয়াজের উপযোগী করে গানটি রচিত হয়।

আমাদের বাল্যজীবনে অনেককেই বলতে শুনতাম যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাল-লয়ের বালাই নেই, রবীন্দ্রনাথের গান কেবল মাত্র ভাবব্যঞ্জক। সে যুগের সঙ্গীত-শিল্পীরা কি কেবল ভাব দিয়াই গান গাইতেন, তাল লয় ছাড়া? এ সম্বন্ধে সঠিক জানা না গেলেও একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে এরূপ ধারণা অহেতুক ও ক্ষতিজনক—আজকাল যে সব রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে তা শুনলেই এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে।

ব্যবহৃত তাল

রবীন্দ্রনাথের গান আজকাল তালেই গাওয়া হয় বলে অনেকে আবার অভিযোগ করেন যে, তাল লয়ের এই বাহুল্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নাকি সে যুগের মতো ভাবব্যঞ্জক আর হয়ে ওঠে না; এই ধারণাও ভুল—কেননা তাল সঙ্গীতের একটা অঙ্গ, ছন্দ সঙ্গীতের রস-পরিবেশনে সহায়তা করে এবং শ্রুতিমধুর করে। বিশিষ্ট শিল্পীর পরিবেশনে সঙ্গীত সঠিক লয় বা ছন্দের বিকাশে গানের ভাবার্থ ক্ষুণ্ণ করে না একথা প্রমাণযোগ্য, অবশ্য গানের লয় নির্দ্ধারণে শিল্পীর শিল্পবোধ থাকা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধারার গানে বহুবিধ লয় ব্যবহারের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিবেশনে শিল্পীর যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকলেও একটু সংযত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্ম-সঙ্গীতকে যদি ছন্দপ্রধান করে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই তার ভাবার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আবার ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদ গানের লয় একরূপ ও খেয়াল গানের লয় ভিন্নরূপ—তাই সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় সঙ্গীত পরিবেশনে শিল্পীর শিল্পবোধের যোগ্যতায়। তবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাল লয় নেই কেবল ভাব আছে একথা ভেবে নেওয়াও যেমন ভুল, তাল লয়ে গাইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাবার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ ধারণাও ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রায় সব তালই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন শাস্ত্রসম্মত ভাবেই,

এমন কি অনেক কূট তালের প্রয়োগও পাওয়া যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। তালে বাঁধা নয় এমন গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতে খুব কমই আছে। ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাল ছাড়াও ছয়টি নূতন তাল রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন, যে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে "নতুন তালের গান " এই পর্য্যায়ে। তাই এগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল না। প্রচলিত তালগুলির মধ্যে আবার বহুবিধ ছন্দের যে সব পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছেন সে সম্পর্কে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে প্রচলিত ও অপ্রচলিত তালে রবীন্দ্রনাথ যে সব সঙ্গীত রচনা করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো, যা থেকে একথা প্রমাণিত হবে যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রায় সব তালেই সঙ্গীত রচনা করেছেন—

দাদ্‌রা—দাদ্‌রা ৬ মাত্রাবিশিষ্ট একটি বহুল প্রচলিত সমপদী তাল। এই তালে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সঙ্গীত-রচনা আছে। এর মাত্রা বিভাগ হবে—১ ২ ৩।৪ ৫ ৬ এই ছন্দে। দাদ্‌রা তালের কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত—

১। আর নাইরে বেলা নামল ছায়া

২। নিশার স্বপন ছুটল রে

৩। যেথায় তোমার লুট হতেছে

৪। প্রলয় নাচন নাচলে যখন

৫। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

তেওড়া—রবীন্দ্রনাথ এই তালটির ব্যবহার করেছেন তাঁর বহু সঙ্গীত রচনায়। এটি একটি ৭ মাত্রার বিষমপদী তাল এবং এর মাত্রা বিভাগ হবে এই ছন্দে—১২৩।৪৫।৬৭ (+)
এই তালের কয়েকটি গান—

১। আমার মিলন লাগি তুমি
২। নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে
৩। আজি বহিছে বসন্ত পবন
৪। কার মিলন চাও বিরহী
৫। লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি
৬। ওগো কিশোর আজি

রূপক—রূপক ৭ মাত্রা বিশিষ্ট একটি বিষমপদী তাল। আজকাল এই তালের বিশেষ প্রচলন নেই। এই তালের মাত্রাবিভাগ হয়েছে—১২।৩৪।৫৬৭ (+) এই ছন্দে। এই তালের গান—

১। হে মন তারে দেখ
২। এমন দিনে তারে বলা যায়

কাহারবা—এই তালটি বহুল প্রচলিত ৮ মাত্রার একটি তাল। এই সমপদী তালের মাত্রা বিভাগ হয়েছে—
+ •
১২৩৪।৫৬৭৮ এই ছন্দে। এর গান—

১। ঐ আসনতলের মাটির পরে
২। বিরহ মধুর হলো আজি

৩। বিশ্ব সাথে যোগে যেথায়

৪। তুমি কি কেবলি ছবি

৫। মায়াবনবিহারিণী হরিণী

৬। শ্রাবণের গগনের গায়

ঝাঁপতাল—এই তালটি ১০ মাত্রার একটি বিষমপদী তাল। রবীন্দ্রনাথ এই তালে বহু গান রচনা করেছেন। এর

+ •

মাত্রা বিভাগ হয়েছে—১ ২।৩ ৪ ৫।৬ ৭।৮ ৯ ১০ এই ছন্দে। এই তালের গান—

১। মনোমোহন গহন যামিনী শেষে

২। আমি কী বলে করিব নিবেদন

৩। হৃদয় নন্দন বনে

৪। পুষ্প ফোটে কোন কুঞ্জবনে

৫। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

৬। তোমার আমার এই বিরহের

সুরফাক্তা—এই তালটি ১০ মাত্রার একটি বিষমপদী তাল। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ জাতীয় গানেই এর ব্যবহার

+

সমধিক। এর মাত্রা বিভাগ হয়েছে ১২৩৪।৫৬।৭৮৯১০। উত্তর ভারতে এর মাত্রা বিভাগ করা হয় ১২।৩৪।৫৬।৭৮।৯১০ এই ছন্দে এবং তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় ফাঁক থাকে। এই তালের গান—

১। পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ

২। বাজাও তুমি কবি

৩। সুন্দর বহে আনন্দ

৪। প্রথম আদি তব শক্তি

৫। আনন্দ তুমি স্বামী

একতাল—এই তালটি ১২ মাত্রাবিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। খেয়াল জাতীয় গানেই এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাত্রা বিভাগ হয়েছে—১২।৩৪।৫৬।৭৮।৯১০ ১১ ১২ এই ছন্দে। উত্তর ভারতে এই তালটি দ্বিমাত্রিক ছন্দেও ব্যবহৃত হয়। এই তালের গান—

১। মন্দিরে মম কে

২। অল্প লইয়া থাকি

৩। মোরে বারে বারে ফিরালে

৪। হে সখা মম হৃদয়ে রহ

৫। নয়ান ভাসিল জলে

আড়্-খেমটা—এই তালটি ১২ মাত্রাবিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। এর মাত্রা বিভাগ একতালের মতই; তবে অধিকাংশ সময় ঝোঁকের এক মাত্রা আড়িতে চলে বলে এর নাম আড়্-খেমটা। এই তালের গান—

১। হৃদয়ের একূল ওকূল

২। ওগো শোন কে বাজায়

৩। বুঝি বেলা বহে যায়

৪। ওকে বল সখি বল

৫। দুজনে দেখা হল মধুযামিনীরে

চৌতাল—চৌতাল ১২ মাত্রাবিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। ধ্রুপদাঙ্গ গানেই এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাত্রা বিভাগ হয়েছে
+
—১২।৩৪।৫৬।৭৮।৯১০।১১ ১২—এই ছন্দে। তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রার ঝোঁকে ফাঁক দেখানো হয়। এই তালের গান—

১। এ ভারতে রাখো আজি
২। আজি মম মন চাহে
৩। বাণী তব ধায় অনন্ত
৪। আমারে করো জীবন দান
৫। তাঁহারে আরতি করে

আড়া-চৌতাল—এই তালটি ১৪ মাত্রার একটি সমপদী তাল। এই তালটিও ধ্রুপদ গানে ব্যবহৃত হয়। এর মাত্রা
+
বিভাগ হয়েছে ১২।৩৪।৫৬।৭৮।৯ ১০।১১ ১২।১৩ ১৪ এই ছন্দে। পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রার ঝোঁকে ফাঁক দেখান হয়—এই তালের গান—

১। শুভ্র আসনে বিরাজো
২। সংসারে কোন ভয় নাহি
৩। সবে আনন্দ করো

যৎ—এই তালটি ৭ মাত্রার বলে অভিহিত হলেও ফাঁক সমেত হিসাব করলে ১৪ মাত্রায়ই এক একটি তাল সম্পূর্ণ হয়।
+ ০
এই বিষমপদী তালের মাত্রা বিভাগ হবে—১২৩।৪৫।৬৭।৮ ৯ ১০।১১ ১২।১৩ ১৪। যৎ তাল ১৬ মাত্রারও হয়, তার

মাত্রা বিভাগ সমপদী এবং ত্রিতালের ন্যায় কিন্তু একটা দ্বিমাত্রিক ঝোঁক আসে। এই তালের গান—

১। তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি (১৪ মাত্রা)
২। রজনীর শেষ তারা (১৬ মাত্রা)
৩। শুনি ঐ রুনুঝুনু পায়ে (১৬ মাত্রা)
৪। আরো আঘাত সইবে আমার (১৬ মাত্রা)

ত্রিতাল—ত্রিতাল ১৬ মাত্রার একটি সমপদী তাল। খেয়াল গানে এই তালের ব্যবহার খুবই বেশী। এই তালের

+ ০

মাত্রা বিভাগ হয়েছে ১২৩৪।৫৬৭৮।৯ ১০ ১১ ১২।১৩ ১৪ ১৫ ১৬ এই ছন্দে। এই তালের গান—

১। আজি কমলমুকুলদল খুলিল
২। এসো শ্যামল সুন্দর,
৩। আঁখিজল মুছাইলে জননী
৪। ডাকে বার বার ডাকে
৫। দাও হে হৃদয় ভরে দাও

আড়াঠেকা—এই তালটি ১৬ মাত্রার একটি বিষমপদী তাল। টপ্পা গানেই এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাত্রা বিভাগ

০ ১ ২´ ৩ ০

হয়েছে ০।০০০০।০০০০।০০০০।০০ এই ছন্দে। এই তালের গান—

১। প্রাণের প্রাণ জাগিছে
২। একি করুণা করুণাময়
৩। আইল আজি প্রাণসখা

৪। এ মোহ আবরণ খুলে দাও

৫। নিশিদিন চাহ রে

মধ্যমান—এই তালটি ১৬ মাত্রার বলা হয়ে থাকে, কিন্তু দেখা যায় যে ৩২ মাত্রায় এর এক একটি ছন্দ সম্পূর্ণ হয়। এই বিষমপদী তালের মাত্রা বিভাগ হয়েছে

```
১                   ২
০ ০ ০ ০ ০ ০ ।০ ০ ০ ০
৩                 ০                   ১
০ ০ ০ ০ ।০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ।০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ।০ ০
```

এই ছন্দে। এই তালটিও টপ্পা গানে ব্যবহৃত হয়। এই তালের গান—

১। এ পরবাসে রবে কে হায়

২। কে বসিলে আজি

৩। দিন যায়রে দিন যায়,

৪। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে একাধিক তাল ব্যবহৃত হয়েছে। একই গানে বিভিন্ন লয়ের ব্যবহার রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। তবে একই

তালফেরতা

গানে বিভিন্ন তালের ব্যবহার খুব বেশী করা হয়নি এবং যে কয়টি গানে করা হয়েছে তার অধিকাংশই সম্মেলক সঙ্গীতের উপযোগী করে রচিত। নিম্নলিখিত গানগুলিতে একাধিক তালের ব্যবহার করা হয়েছে—

১। আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে

২। মধুগন্ধে ভরা

৩। নৃত্যের তালে তালে

৪। বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে

৫। ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

৬। কালী কালী বলরে আজ

৭। বাজিবে সখি, বাঁশী বাজিবে

৮। হে নিরুপমা, হে নিরুপমা

৯। শুধু যাওয়া আসা

১০। আমার মালার ফুলের দলে

একটি গানের চারটি কলির মধ্যেই একাধিক তালের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু একটি সম্পূর্ণ গানে পৃথকভাবে তালের পরীক্ষা সম্পর্কে এবার আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সঙ্গীত রচনা পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একই সুর বজায় রেখে একাধিক তালের ব্যবহারে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। একই সুর বজায় রেখে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য ভাবে সুর বদল করে অথচ স্বতন্ত্র ছন্দের প্রয়োগে এক একটি গানই পৃথক রচনার মত মনে হয়।

ছন্দান্তর ও সুরান্তর

একই সুর বজায় রেখে সম্পূর্ণ গানেই স্বতন্ত্র ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে এইরূপ কয়েকটি গানের তালিকা দেওয়া হলো—

১। যেতে যেতে একলা পথে—ঝম্পক ও দাদ্‌রা

২। সংশয় তিমির মাঝে—কার্ফা ও তেওড়া

৩। হেরি অহরহ তোমারি বিরহ—একতাল ও চৌতাল

৪। আঁধার অম্বরে—কার্ফা ও আদ্ধা

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সঙ্গীত রচনা পাওয়া যায়, যে ক্ষেত্রে একই গানে স্বতন্ত্র সুর ও তালের প্রয়োগ করা হয়েছে। উপরোক্ত গান কয়টি এবং এর পরে যে সব গানের তালিকা দেওয়া হবে সেই সব গান পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই ছন্দান্তর ও সুরান্তরের জন্য কয়েকটি গান এক একটি বিপরীতপন্থী ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। উপরোক্ত "হেরি অহরহ তোমারি বিরহ" গানটি একতালে বাঁধা হলে এটি রাগসঙ্গীত রচনার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চৌতালে এটি শাস্ত্রসম্মত ভাবে ধ্রুপদ পর্য্যায়ে স্থান পাবে। স্বতন্ত্র সুরে ও ছন্দে রচিত একই গানের যে তালিকা নীচে দেওয়া হলো তার মধ্যে দেখা যায় যে এই সব পরিবর্ত্তনের জন্য একই গান, এমনকি লোক-সঙ্গীত ও রাগ-সঙ্গীত ইত্যাদি, ভিন্ন আদর্শের ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অনেকেই এই সব গানের একটি সুরের সহিতই পরিচিত, দ্বিতীয় সুর ও ছন্দ এখন পর্য্যন্ত অপ্রচলিত রয়েছে এবং তাদের স্বরলিপিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়নি। বর্ত্তমানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বহুল প্রসারের মধ্যে এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

১। দখিন হাওয়া জাগো জাগো
২। আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে
৩। ঝড়ে যায় উড়ে যায়
৪। শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে

৫। লক্ষ্মী যখন আসবে
৬। বসন্তে কি শুধুই কেবল
৭। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে
৮। বাজাও আমারে বাজাও
৯। হে সখা বারতা পেয়েছি
১০। কী বেদনা সেকি জান

উপরোক্ত তালিকার শেষ দুইটি গানে সামান্য পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় কিন্তু কাব্যাংশের এই পরিবর্ত্তন খুব অল্প বলে এদের পরবর্ত্তী আলোচনায় রূপানুবর্ত্তিত গান বলা হয়নি।

হিন্দি বা অন্যান্য সুরের হুবহু মিল যেমন রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় পাওয়া যায়, তেমনি একই সুরে একাধিক নিজস্ব সঙ্গীত রচনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন। বিদেশী সুরের রূপানুবর্ত্তিত গান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে "বিদেশী সুরের গান" শীর্ষক ধারায়।

রূপানুবর্ত্তন

একই সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে একাধিক সঙ্গীত রচনা করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করব। একই গানে একাধিক সুর ও ছন্দের ব্যবহার নিয়ে এর পূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত গানগুলি একই সুরে রচিত হয়েছে—

১। "চলে ছল ছল নদীধারা" এবং "দেখো দেখো শুকতারা"
২। "কোন দেবতা সে" এবং "দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে"
৩। "বাকী আমি রাখবনা" এবং "আমার এই রিক্ত ডালি"

৪। "দেখা না দেখায় মেশা" এবং "স্বপ্নমদির নেশায়"

৫। "বসন্তে ফুল গাঁথল" এবং "অশান্তি আজ হানল"

৬। "যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়" এবং "ধরা সে যে দেয় নাই"

৭। "হাসি কেন নাই ও নয়নে" এবং "সমুখেতে বহিছে তটিনী"

৮। "স্বপন লোকের বিদেশিনী" এবং "অনেক দিনের মনের মানুষ"

৯। "হৃদয় মোর কোমল অতি" এবং "আঁধার শাখা উজল করি"

উপরোক্ত গানগুলি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ গানই বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে রূপানুবর্ত্তিত হয়েছিল। কয়েকটি গানের দু একটি কথা মাত্র বদল করে অথচ একই সুর রেখে নাটকের উপযোগী করে লেখা হয়েছে, এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে' ("পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে"), 'আমি তোমারে করিব নিবেদন' ("আমি কী বলে করিব নিবেদন"), 'সন্ত্রাসের বিহ্বলতা' ("সংকোচের বিহ্বলতা") ইত্যাদি গানে। নাটকের গান ছাড়াও কয়েকটি গান সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য ভিন্নরূপ পেয়েছে। বসন্ত ঋতুর গান "ওরা অকারণে চঞ্চল", এই গানটিতে সামান্য পরিবর্ত্তন করে বর্ষার গান করা হয়েছে—

ওরা অকারণে চঞ্চল

ডালে ডালে দোলে বায়ু হিল্লোলে নব পল্লব দল ॥

ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো দিকে দিকে ওরা কি খেলা খেলালো

মর্ম্মর তানে ওরা আনে কৈশোর কোলাহল ॥

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে নীরবের কানাকানি,

নীলিমার কোন বাণী।

ওরা প্রাণ ঝরণার উচ্ছল ধার, ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ু হিল্লোলে নব পল্লব দল ॥
বাতাসে বাতাসে প্রাণ ভরা বাণী, শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি
মর্ম্মর তানে দিকে দিকে আনে কৈশোর কোলাহল ॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণ ঝরণার উচ্ছল ধার, ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

বসন্তের "বাকী আমি রাখবনা" গানটির সঞ্চারীর প্রথমে 'দখিন্' কথাটিকে 'পূরব' করে দিয়ে ঠিক এই ভাবে রূপানুবর্ত্তিত করা হয়েছে। "চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে" গানটির আরম্ভে "উতলপবনে মম কুঞ্জবনে" এইটুকু পরিবর্ত্তন দ্বারা এটি রূপানুবর্ত্তিত হয়েছে। 'নটীর পূজা'র গান—'ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে', এই গানটির প্রথম পংক্তিটি "ওরে কি অপরূপ রূপ দেখরে" এই রকম পরিবর্ত্তিত করে গানটি বিবাহ-সঙ্গীতের উপযোগী করা হলো। ধর্ম্মসঙ্গীত 'সার্থক করো সাধন' গানটী আছে—

সার্থক কর সাধন,
সান্ত্বন কর' ধরিত্রীর বিরহাতুর কাঁদন।
প্রাণতরণ দৈন্যহরণ অক্ষয় করুণাধন।

বিকসিত কর কলিকা,
চম্পকবন করুক রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা,
কর সুন্দর গীতমুখর নীরব আরাধন।
অক্ষয় করুণাধন ॥
চরণ-পরশ-হরষে
লজ্জিত বনবীথি ধূলিসজ্জিত তুমি কর' সে।
মোচন কর অন্তরতর হিম-জড়িমা-বাঁধন।
অক্ষয়করুণাধন ॥

এই ধর্ম্ম-সঙ্গীতটি রূপানুবর্ত্তিত হয়ে বিবাহ-সঙ্গীত রূপে দাঁড়ালো—

সার্থক হল সাধন।
তৃপ্তি লভিল তৃষিত চিত্ত শান্ত বিরহ কাঁদন,
প্রাণভরন দৈন্যহরণ অক্ষয় করুণাধন।
বিকসিত হল কলিকা,
মম কানন করিল রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা,
হল সুন্দর গীতমুখর নীরব আরাধন ॥
চরণ-পরশ-হরষে
লজ্জিত বনবীথি ধূলি সজ্জিত কর কর হে,
মোচন কর অন্তরতর হিম-জড়িমা-বাঁধন ॥

"মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন" গানটিও 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন', 'শান্তিমন্দির পুণ্যঅঙ্গন' ও 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গন' এই ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং প্রথম পংক্তিটি ছাড়াও এই গানগুলির

আঙ্গিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। ১৩৩১ সালে 'সাত ভাই চম্পা' ছবিকে অবলম্বন করে লিখলেন—

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধু মঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।

১৩৪০ সালে এই কবিতাটিকে সুর দেওয়ার সময় এটি দাঁড়ালো—

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকামাল্যের বন্ধন।

"নমো নমো শচীচিতরঞ্জন" গানটি পরিবর্ত্তিত হয়ে প্রথমে হলো "তুমি তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি", এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র জন্য হলো "তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি"। এই তিনটি গানেই যথেষ্ট আঙ্গিক পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। ভাষার বিচারে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে এমন বহু গান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় স্থান পেয়েছে, যাদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,' এবং 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর' এই গানের স্থানে স্থানে পাঠান্তর আছে কিন্তু সুরের সাদৃশ্যই রক্ষিত হয়েছে। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে, এবং 'আজি বরিষণ মুখরিত' এই গান কয়টির স্থানে স্থানে বাণীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয় কিন্তু সুর-যোজনায় কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। "বিশ্ববীণা রবে" গানটির কয়েকটি পংক্তি বদল করে গানটিকে একাধারে বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর উপযোগী করে রচিত হয়েছে। 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' গানটি 'আজি এ সন্তান দুটি' এই গানের পরিবর্ত্তিত রূপ।

ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী

তালের ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ্য করা গেছে ঠিক তেমনি রাগ-রাগিণীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে প্রচলিত প্রায় সব রাগ-রাগিণীর গানই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আছে, এমন কি বহু কূট রাগের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ইত্যাদি রচনাকাল থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-রচনার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেন নি একথা জানা যায়। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গানই রাগ-রাগিণীর উপাদান নিয়ে রচিত হলেও তাদের বাঁধুনী ঠিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নয়। পরবর্ত্তী-কালের গানেও মিশ্র রাগেরই পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। ১৯০৯।১০ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনা পর্য্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত ভাবে রাগ-রাগিণীর ব্যবহারের একটা

পরিচয় পাওয়া যায়। দশটির কম গান রচিত হয়েছে, এমন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করা হয়নি—

১। ভৈরবী—৪৭
২। বেহাগ—৩২
৩। বাহার—২৪
মিশ্র বাহার-৪
৪। কাফি—১৮
৫। ইমন কল্যাণ—১৮
মিশ্র ইমন কল্যাণ-৩
৬। ঝিঁঝিট—১৭
মিশ্র ঝিঁঝিট-৯
৭। খাম্বাজ—১৬
৮। টোড়ি—১৫
মিশ্র টোড়ি-১
৯। সিন্ধু—১৪
মিশ্র সিন্ধু-১১
১০। ভৈরোঁ—১৪
মিশ্র ভৈরোঁ-২
১১। হাম্বীর—১৪
১২। কানাড়া—১৩
মিশ্র কানাড়া-৪
১৩। রামকেলি—১৩
মিশ্র রামকেলি-৩

১৪। পিলু—১২
মিশ্র পিলু-২
১৫। ভূপালী—১২
মিশ্র ভূপালী-২
১৬। বিভাস—১২
মিশ্র বিভাস-২
১৭। দেশ—১১
মিশ্র দেশ-৩
১৮। ছায়ানট—১০
মিশ্র ছায়ানট-৩
১৯। আলাইয়া—১০
২০। পূরবী—১০
মিশ্র পূরবী-২
২১। আশাবরী—১০

উপরোক্ত তালিকা থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগ-রাগিণী গুলি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। এর পরে দশটি ঠাট্‌কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের রাগসম্মত রচনার একটি তালিকা দেওয়া হল। উদাহরণ স্বরূপ প্রতিটি রাগ-রাগিণীর একটি গানের উল্লেখ করা হয়েছে।

কল্যাণ ঠাট

ইমন—সুন্দর বহে আনন্দ
ভূপালী—প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল
কামোদ—যতবার আলো জ্বালাতে চাই

ভূমিকা

কেদারা—ডাকে বার বার ডাকে

হাম্বীর—আনন্দ রয়েছে জাগি

শ্যাম—নয়ান ভাসিল জলে

ছায়ানট—ভক্ত হৃদি বিকাশ

গৌড়সারং—পেয়েছি সন্ধান তব

বিলাওল ঠাট

আলাইয়া—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

দেশকার—কামনা করি একান্তে

লচ্ছাসার—বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ

কুকভ—কোথায় তুমি আমি কোথায়

সরফর্দা—জগতে আনন্দ যজ্ঞে

দেবগিরি—দেবাধিদেব মহাদেব

বেলাবলী—হে মন তাঁরে দেখ

বিহগড়া—মনে রয়ে গেল মনের কথা

শঙ্করাভরণ—বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে

বেহাগ—জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে

হেমখেম—সবে মিলি গাওরে

খাম্বার—নিত্য নব সত্য তব

বিভাস—আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ

শঙ্করা—আমারে কর জীবন দান

কাফি ঠাট

কাফি—মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

বাহার—আজি কমলমুকুলদল খুলিল

বাগেশ্রী—নিশীথে শয়নে ভেবে রাখি মনে
বড়হংসসারঙ্গ—তাঁহারে আরতি করে
সাহানা—নিবিড় ঘন আঁধারে
সুহা কানাড়া—নাথ হে প্রেমপথে
বৃন্দাবনী সারং—জয় তব বিচিত্র আনন্দ
মেঘ—তিমিরময় নিবিড় নিশা
গৌড় মল্লার—আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
শুদ্ধ মল্লার—ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
নায়কী কানাড়া—সুধা সাগর তীরে
পিলু—এসেছি গো এসেছি
ভীম পলশ্রী—বিপুল তরঙ্গ রে
সিন্ধুড়া—জরজর প্রাণে নাথ
নটমল্লার—মোরে বারে বারে ফিরালে
সিন্ধু—প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ
মিঞামল্লার—গহন ঘন ছাইল
গৌড়—হে নিখিল ভার

খাম্বাজ ঠাট

ঝিঁঝিট—তোমারি মধুর রূপে
খাম্বাজ—রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
সুরট—এ ভারতে রাখো আজি
সুরট মল্লার—দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
দেশ—জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত
জয়জয়ন্তী—জীবন যখন শুকায়ে যায়
তিলক-কামোদ—শান্তি কর বরিষণ

ভৈরব ঠাট

ভৈরোঁ—শুভ্র আসনে বিরাজো
রামকেলি—আঁখিজল মুছাইলে জননী
যোগিয়া—নিশিদিন চাহরে
কালাংড়া—ভালবাসিলে যদি
জিলফ্—প্রেমের ফাঁদ্ পাতা
গুণকেলি—জননী তোমার করুণ চরণখানি
ভাটিয়ার—হৃদয় নন্দন বনে

আশাবরী ঠাট

আশাবরী—মনমোহন গহন যামিনী শেষে
দরবারী কানাড়া—শুনি ঐ রুণু ঝুণু পায়ে
আড়ানা—মন্দিরে মম কে
খট্—সদা থাক আনন্দে
কানাড়া—এবার নীরব করে
সিন্ধু ভৈরবী—যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
গান্ধারী—বিমল আনন্দে জাগোরে

টোড়ি ঠাট

টোড়ি—রজনীর শেষ তারা
মুলতান—বুঝি বেলা বয়ে যায়
গুর্জরী টোড়ি—প্রভাতে বিমল আনন্দে

পূরবী ঠাট

পূরবী—বীণা বাজাও হে
পরজ—ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে

পরজ-বসন্ত—গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
গৌড়-পূরবী—ঘাটে বসে আছি
শ্রীরাগ—কার মিলন চাও বিরহী

মারোয়া ঠাট

ললিত—পান্থ এখনো কেন
দীপক পঞ্চম—প্রথম আদি তব শক্তি
পূর্ব্ব কল্যাণী—বাসন্তী হে ভুবন মনমোহিনী

ভৈরবী ঠাট

ভৈরবী—আনন্দ তুমি স্বামী
মালকোষ—আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
খট ভৈরবী—আমার এই যাত্রা হলো সুরু
নাচারী টোড়ি—নূতন প্রাণ দাও

'গীত-বিতান', তৃতীয় খণ্ডে—রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রচলিত সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু 'সঙ্গীত-কোষ', 'সঙ্গীত-রত্নাবলী', 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ইত্যাদি বইতে বহু গানের সন্ধান পাওয়া যায়, যার উল্লেখ 'গীত-বিতানে' নেই, অথচ এই সব রবীন্দ্র-নাথেরই রচনা বলে জানা গেছে। যদিও এই সব গানের সুর আজ প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মতই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বইগুলিতে এই গানের সুর ও তালের উল্লেখ আছে। কাজেই মনে করা যায় যে, এই সব রচনা সঙ্গীত হিসাবেই রচিত হয়েছিল এবং

অপ্রচলিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত

সে যুগে গীত হতো। এই সব গানের হারিয়ে যাওয়া সুর পুনরুদ্ধার করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, নইলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার আদি পর্ব্বের একটা বড়ো অংশই লুপ্ত হয়ে যাবে। সাহিত্যের বিচারে এদের কাব্যাংশ কালোপযোগী না হতে পারে, সুর-যোজনার আদর্শে এরা প্রাচীনপন্থী হতে পারে, কিন্তু এরা অবহেলার বস্তু নয়। বাংলা দেশের সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা, তা নির্দ্ধারণ করতে হলে বিভিন্ন কালোপযোগী বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার পরিচয় প্রয়োজন, গুণাগুণের বিচারে আংশিকভাবে এর প্রচার যুক্তিসম্মত নয়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও রবীন্দ্রনাথের যে পরিচিতি "সঙ্গীত-মুক্তাবলী" বইতে দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করা হলো—"এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর-বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিষ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।" এই কয়টি কথা থেকেই বোঝা যায় যে বর্তমান কালোপযোগী না হলেও একদিন এই সব রচনা খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং এই কারণেও এদের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অপ্রচলিত সঙ্গীত রচনার একটা তালিকা দেওয়া হলো, যে সব গানের উল্লেখ পাওয়া যায় না—

১। আজ একেলা বসিয়া
২। আমি তারে চোখের দেখা দেখে আসি
৩। আর আমায় আমি নিজের শিরে
৪। আর বুঝতে বাকি নাইক
৫। আয়রে ভাই সবে মিলে সবান্ধবে
৬। এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে
৭। একা আমি ফিরব না আর
৮। একা একা এত দিন
৯। এত হাসি কেন আজ
১০। কাঁদি কাঁদি বুক বাঁধি
১১। ডাকো ডাকো ডাকো আমারে
১২। তার' তার' তার' হরি দীনজনে
১৩। তুমি কি বুঝিবে সখা
১৪। তুমি যখন গান গাহিতে বলো
১৫। তোমার দয়া যদি

১৬। তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
১৭। তোমার প্রেম যে বইতে পারি
১৮। তোমার হাতের রাখী খানি
১৯। দয়া করে ইচ্ছা করে
২০। দীন দয়াময় ভুলোনা অনাথে
২১। দুটো দুখের কথা কই
২২। নামাও নামাও আমায়
২৩। নাহি ভয় নাহি ভয় তার
২৪। ফুলের মতন আপনি ফুটাও
২৫। বনে বনে ফিরি
২৬। যায় যাবে প্রাণ তবু
২৭। যে তোরে বাসেরে ভাল

এর পরে এই বইয়ের প্রধান বিষয়বস্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান সতেরোটি বিভিন্ন ধারাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকায় যে সব বিষয় বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে তারা বিভিন্ন ধারায় পর্য্যালোচনায় স্থান পায়না, অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির পরিচয় পেতে হলে এই সব বহুবিধ বৈচিত্র্যের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া খুবই প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্যই পূর্ব্বভাগে এই সব বৈচিত্র্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

ভানুসিংহের পদাবলী

'কবি ভানুসিংহ' এই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে যে সব রচনা করেছিলেন, সেগুলি তাঁর প্রাচীনতম রচনার অন্তর্গত। 'ভানুসিংহের পদাবলীর' অধিকাংশ রচনার সময়কাল ইংরাজী ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথেব ষোল থেকে পঁচিশ বছর বয়সকালের মধ্যে। 'ভানুসিংহের পদাবলীব' অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ বলা যায় এই কারণে যে, এই ধারার রচনায় গঠনমূলক আদর্শে এবং সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে একটা স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কারভাবেই লক্ষ্যণীয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে বচিত এই ধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

"গাছের বীজেব মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্ত্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমাব ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার

চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও এখন এইরূপ রহস্য আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ……একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারী খুসী হইলাম—তখনি এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল "বেশতো, এতো বেশ হইয়াছে।" ……ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাহার লেখা যদি বর্ত্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্ত্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে—কিন্তু তাহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিলনা।"

ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম রচনার সময়কাল রাংলা ১২৮৪ সনের বর্ষাকালে, ইংরাজি ১৮৭৭ সালের সময়। "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" এই গানটিই এই পর্য্যায়ের প্রথম রচনা এবং এর পর ক্রমান্বয়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ

২২টি পদ রচনা করেন। আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই প্রথমত কবিতা হিসাবেই রচিত হয়েছে—পরে সুর দিয়ে তাদের গানের দলে আনা হয়েছে। ভানুসিংহ ঠাকুরের রচনাগুলিও প্রথমে বৈষ্ণব-পদের অনুকরণেই রচিত হয়েছিল। যদিও এই সব পদগুলির রচনাকাল জানা যায় কিন্তু এর যে সব পদে সুর সংযোজিত হয়েছে তার সঠিক সময়কাল সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই ধারার রচনার যে কটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত জানা যায়, সেই সব স্বরলিপি-পুস্তকের প্রকাশ-কাল বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে ভানুসিংহের পদাবলীর যে কয়টি পদে সুর বসানো হয়েছিলো তার সময়কাল ১৮৯০ সালের পূর্ব্বে। ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় "সজনি গো, আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা" এই রচনাটি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়—এই গানটিই পরিবর্ত্তিত হয়ে "সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা" এইরূপে গানের দলে স্থান পেয়েছে।

সুর-সংযোজনার দিক থেকে জানা যায় যে ভানুসিংহ ঠাকুরের ২২টি পদের মধ্যে মাত্র ৯টিতে রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভানুসিংহ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্রনাথ কবি বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর" এবং কবি গোবিন্দ দাসের "সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি" এই দুটি গানে সুর দিয়েছিলেন। ভানুসিংহ

ঠাকুরের যে সব রচনায় সুরসংযোজিত হয়েছিল সেগুলি হলো—

১। গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
২। শুনলো শুনলো বালিকা
৩। সজনি সজনি রাধিকা লো
৪। মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান
৫। বজাওরে মোহন বাঁশী
৬। সজনি গো, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা
৭। আজু সখি মুহু মুহু
৮। হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
৯। অতিমির রজনী, সচকিত সজনী

অন্যান্য পদকর্ত্তাদের রচিত যে দুইটি পদে ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্ম নামে রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছিলেন তা হলো—

১। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—কবি বিদ্যাপতি
২। সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি—কবি গোবিন্দদাস

নূতন তালের গান

"সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে উঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করেছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি কর্ত্তৃত্বের আসন কে পায়, মাঝে থেকে সঙ্গীতের আত্মবিরোধ ঘটে। তাল জিনিষটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ, এর দরকার খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হোতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করতে হয়েছে কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশী ছাড়া পেয়েছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকিয়ে না চলে তবে তো সে নাস্তানাবুদ করতে পারে। কর্ত্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশি

কড়া হয়না, কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হয়ে কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুলচেরা হিসাব দাখিল করতে হয়। সেখানে কণ্ট্রোলার আপিস কেবলি খিটিখিটি করে এবং কাজ চালাবার আপিস বেজার হয়ে উঠে। ······কিন্তু হ্যুল আমলে এ সমস্ত উৎপাত চল্‌বে না। আমরা শাসন মানব, তাই বলে অত্যাচার মানব না······এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা থেকে মুক্তি দিলে তবে তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত কর্‌তে থাকবে। ··· ··· যারা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছেড়ে রাখে তারাই রাখে। ······কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিষটি সৃষ্টি ব্যাপ্ত করে আছে; আকাশের তারা থেকে পতঙ্গের পাখা পর্য্যন্ত সমস্তই একে মানে বলেই বিশ্বসংসার এমন করে চলেছে অথচ ভেঙ্গে পড়ছে না। অতএব কাব্যেই কী গানেই কী এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটলেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই। ······কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেইকাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলবে এই ভরসা করে গান বাঁধতে চাইলেম।"

উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির স্বরূপ কি তা জানতে পারি। আমরা জানি যে

রবীন্দ্রনাথ ছয়টি নতুন তাল সৃষ্টি করে ভারতীয় সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু কেন এবং কিসের প্রয়োজনে এই সৃষ্টির অবতারণা তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রয়োজন কেন তা আমাদের জানতে হবে—এবং ভালভাবেই জানতে হবে—নইলে কেবলমাত্র এই নতুন কয়টি তাল সম্পর্কে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শে তাঁর রচনার মধ্যে বিভিন্ন এবং অভিনব যেসব পরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন তা আমাদের অগোচরেই রয়ে যাবে। বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে নব নব সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সার্থকতা হলো সেখানেই—একথা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির প্রথম দিকে তিনি সে-যুগের সঙ্গীত এবং তার শাস্ত্রকেই মর্য্যাদা দিয়েছেন বেশী কিন্তু সে-সব সৃষ্টি তাঁকে সুখী করতে পারেনি—কেননা এই সব সুরধর্ম্মী রচনার মধ্যে ছিল কেবলমাত্র প্রাচীন রীতি ও নীতির স্বীকৃতি, নিজস্ব সৃষ্টির অভাব যে সেখানে ছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয়নি—এবং তাই পরিণত বয়সে তিনি এই সব শাস্ত্রসম্মত গণ্ডী ও বিধিনিষেধের বাইরে এসে নানা পরীক্ষা করে চললেন আমাদের সঙ্গীতকে নিয়ে, এই সব পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এল সেই সব সঙ্গীত-সম্পদ যা উন্নত শিরে সগর্ব্বে আপন নিজস্বতা এবং বৈশিষ্ট্যের স্থায়ী শিকড় গেড়েছে, যাকে পরকীয়া বলবার কোনো যুক্তির অবকাশই

নেই। সঙ্গীতের মধ্যে কাব্যাংশের প্রাধান্য রক্ষায় রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত ছিলেন তা জানা যায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মধ্যে, এবং সেই কারণেই ক্রমশঃ তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি কাব্যধর্ম্মী হয়ে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে ছয়টি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন তার প্রয়োজন হয়েছিল এই কাব্যাংশকে মর্য্যাদা দিতেই—নিছক নতুন সৃষ্টির নেশায় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে গানকে যথাসম্ভব শাস্ত্রসম্মত করতে গিয়ে, প্রচলিত তালে বাঁধতে গিয়ে, বাণীর অঙ্গহানি হয়েছে, উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটেছে। নতুন ছয়টি তাল সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ এই সব অসুবিধা দূর করতেই চেষ্টা করেছেন একথা তিনি নিজেও বহুভাবে বহুবার বলেছেন। গানের কাব্যাংশকে মর্য্যাদা দিতে হলে, ছন্দের গতি এমন করতে হবে যাতে সুর সংযোজনার পরে কাব্যাংশ ক্ষুণ্ণ না হয়। সঙ্গীতের গতি সাবলীল রাখবার জন্য এবং কাব্যাংশকে মর্য্যাদা দেবার অনুপ্রেরণায় তিনি নিত্য নূতন পথের সন্ধান করেছেন, নতুন তাল কয়টির সৃষ্টির উৎসস্থল হলো সেই একই প্রেরণা।

এইখানে এই ছয়টি নতুন তালে রচিত কয়েকটি গানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো—

ঝম্পক—৫ মাত্রা

(মাত্রাবিভাগ ৩+২)

১। আমারে যদি জাগালে আজি নাথ

২। বিপদে মোরে রক্ষা করো
৩। পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ
৪। শুভ্র নব শঙ্খ তব

ষষ্ঠী—৬ মাত্রা

(মাত্রাবিভাগ ২+৪)

১। নিদ্রাহারা রাতের এ গান
২। আমার ভুবনত আজ
৩। জ্বলেনি আলো অন্ধকারে
৪। জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায়না
৫। হৃদয় আমার প্রকাশ হলো (ছন্দ ৪+২)
৬। হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে (ছন্দ—একত্রে ৬ মাত্রা)

রূপক্‌ড়া—৮ মাত্রা

(মাত্রাবিভাগ ৩+২+৩)

১। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
২। ঐ রে তরী দিল খুলে
৩। এই শরৎ আলোর কমল বনে
৪। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
৫। জীবনে যত পূজা
৬। কত অজানারে জানাইলে তুমি

নবতাল—৯ মাত্রা

(মাত্রাবিভাগ—৩+২+২+২)

১। নিবিড় ঘন আঁধারে

২। প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে

৩। ব্যাকুল বকুলের ফুলে (ছন্দ—৫+৪)

৪। দুয়ার মোর পথপাশে (ছন্দ—একত্রে ৯ মাত্রা)

একাদশী—১১ মাত্রা

(মাত্রাবিভাগ—৩+২+২+৪)

১। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া

২। কাঁপিছে দেহলতা থরথর (ছন্দ ৩+৪+৪)

নবপঞ্চক—১৮ মাত্রা

(মাত্রা বিভাগ—২+৪+৪+৪+৪)

১। জননী তোমার চরণখানি

এই তালিকায় রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক তালে উল্লিখিত গান কয়টি ছাড়া আর রচনা নেই। ঝম্পক ও ষষ্ঠীতালে রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক রচনা পাওয়া যায়।



লোকসঙ্গীত

এ দেশের সঙ্গীত-সৃষ্টির ইতিহাসের আদিপর্ব্ব এখনও জানা যায়নি তার কারণ এই যে, প্রাচীন কালে সঙ্গীতের ব্যবহার সামাজিক ও আশ্রমিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় যে সঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছিল ভগবৎপ্রেম ও অন্তরের প্রেরণাই ছিল তার উৎসস্থল। স্বাভাবিক ভাবেই এই সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল সাধকদের অন্তরে—চেতনা ও আত্মশুদ্ধির ভাষায় তা সঙ্গীতের মাধ্যমেই বিকাশ হতো। আশ্রমজীবনে সঙ্গীতের ব্যবহার ব্যাপকভাবেই করা হতো, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পৌরাণিক কাব্যে পাই—আজকের ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের শাস্ত্রে সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং রাগ-রাগিণীর নামকরণ পর্য্যালোচনা করলে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাবে যে ধর্ম্মগত কারণে এবং দেবদেবীর বন্দনার প্রয়োজনেই ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন যে সব সাধক নিছক সঙ্গীত সৃষ্টির প্রেরণাই তাঁদের মূলধন ছিল না।

ভারতীয় সঙ্গীতকে মোটামুটি ভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীর সঙ্গীত আছে যার দখল পেতে হলে শিক্ষা, সাধনা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, আর এক শ্রেণীর সঙ্গীত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই

সৃষ্ট হয়েছে এবং এই শ্রেণীর সঙ্গীতের দখল পেতে ব্যাপক চর্চ্চা বা শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না, তাই এই শ্রেণীকে 'লোক-সঙ্গীত' বলা হয়ে থাকে। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে লোক-সঙ্গীতকে উচ্চাসন বা মর্য্যাদা কোনোদিনই দেওয়া হয়নি, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেদিনের লোকসঙ্গীতের অংশ আজ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে রূপানুবর্ত্তিত। কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ না করে সাধক-সম্প্রদায় যে ভজন সৃষ্টি করেছেন, আজ তা সঙ্গীত সমাজে কৌলিন্য দাবী করে। যে 'টপ্পা' ছিল পথে ঘাটে গেয়ে অন্ন সংস্থানের উপায়, আজ তাই হয়েছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে সাধনার বিষয়বস্তু। কাজেই বলা যেতে পারে যে, লোক-সঙ্গীতের মধ্যেই আজকের ভারতীয় সঙ্গীতের গোড়াকার কথার সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলা গানের একেবারে গোড়াকার কথা জানতে হলে আমাদের এসে পৌঁছতে হয় সমাজের তথাকথিত নীচের স্তরে, যেখানে প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা রক্ষিত হয়েছে আউল, বাউল, দরবেশ, এদের সঙ্গীতের মধ্যে। খুব সহজ সুর আর সিধে কথার মধ্য দিয়ে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশে আমাদের এই সব লোক-সঙ্গীত অতুলনীয়। আজকাল নানা রকম সুরের মাধ্যমে বাংলা গানের নানারকম ঢঙের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু বাংলা দেশের নিজস্ব সঙ্গীত রচনার বিশেষত্ব-গুলি রয়েছে বাউলের গানে, কীর্ত্তনে, ভাটিয়াল ও ঝুমুর

প্রভৃতি গানের মধ্যে, রামপ্রসাদী গানে। প্রাচীন কাল থেকে নানারকম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বিদেশী শিক্ষাপ্রসারের ফলে আমাদের দেশে সঙ্গীতরূপ জাতীয় সম্পদগুলি সহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তা ঘটে; বিদেশী রুচি সম্পূর্ণ অভিনবত্বের মোহজাল বিছিয়ে আকর্ষণ করেছিল আমাদের মনকে—এই বিদেশী প্রভাব থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের নিজস্ব বিশেষত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা যাঁরা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। বিদেশী চশমার মোহ যখন আমাদের ক্রমে ক্রমে ঘুচে যেতে লাগলো, তখন আমরা নিজেদের ফিরে পাবার চেষ্টায় এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এবং নিজেদের আবিষ্কার করলাম বাউল, কীর্ত্তন, কবিগানের মধ্যে। যে কীর্ত্তন আভিজাত্য খুইয়ে বৈষ্ণবপন্থীদের আখড়ায় হীনভাবে দিন কাটাচ্ছিলো, তাই আবার সগৌরবে আসন দখল করলো সমাজের উচ্চস্তরে, কবিগানের আদর হলো, লোকে কান দিয়ে মন দিয়ে বাউলের গান শুনতে লাগলো। সব থেকে প্রথম বোধ হয় পুরানো লোকসঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা হয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের আমলে—যে চেষ্টার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলা গানের কথা ও সুর পারস্পরিক সঙ্গতিবোধ নিয়ে এমন ভাবেই দেখা দিয়েছিল যে, বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিশিষ্টতায় তাকে মণ্ডিত

করে তুলতে তাঁর কখনো বেগ পেতে হয়নি। ভারতবর্ষের যে-আদর্শ এবং যে-সংস্কার তাকে সারা পৃথিবীতে বিশেষ স্থান দিয়েছে তা ফিরে পেতে হলে যে পল্লীর দরবারে ফিরে যেতে হবে সেটুকু বুঝতে রবীন্দ্রনাথের বেশী সময় লাগেনি। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের, বিশেষ করে সমাজের ওপর তলায় যাঁদের বাস তাঁদের মনকে লোকসঙ্গীতের দিকে ফেরাবার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি প্রথমে ঐ সব সঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সব গানকে অন্ত্যজ জ্ঞানে অবহেলা করেন লক্ষ্য করে তিনি নিজেই বাউল গান লিখতে সুরু করেন। তার ফলে আমরা তাঁর রচিত বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, রামপ্রসাদী প্রভৃতি যে সব গানের সম্পদ পেলাম তা সত্যিই অপূর্ব্ব। কেমন করে তিনি এই সব গানের সহজ সরল সত্যটির খোঁজ পান তা আমরা তাঁর প্রকাশিত প্রচুর চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধের মধ্যে পাই। একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ নিজেকে "কবি-বাউল" বলেছেন এবং নিজস্ব নাটকে বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করতে তিনি আনন্দ পেতেন। পদ্মার বুকে নৌকায় যখন তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন তখন নৌকা বেয়ে মাঝিরা যে গান গেয়ে চলে যেতো কিম্বা বাউল এসে নৌকার সামনে নাচগান জুড়ে দিত তার অনেক কথাই তিনি লিখে গেছেন।

সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে সব দেশ আজ পথপ্রদর্শক সে সব দেশে কৌলিন্য প্রথা নেই বলেই

*ভ্রান্ত সম্মানবোধ নেই। এই সব দেশে সামাজিক বা জাতীয় অনুষ্ঠানে, যে সব আচার, পদ্ধতি, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ ও রস পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে তা এমন ভাবেই তৈরী যে সমাজের সকল স্তরের লোকই তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে—উচ্চ-নীচ ভেদ ততটা প্রবল নেই এখানে, তার কারণ সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণ করে এঁরা তাদের জাতীয় সম্পদ অবহেলা করেন না। আমাদের দেশে সব কিছুর মধ্যেই একটা ভ্রান্ত সম্মানবোধ জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষার পথে বাধাস্বরূপ এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, সংস্থান ও প্রগতির পথে, একটু অসামান্য হলেই সামান্যর প্রতি অবহেলা দেখানো আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়নি—শিক্ষা ও সাধনার বিনিময়ে যে সব শিল্পী পারদর্শিতা অর্জ্জন করলেন, তাঁরা লোক-সঙ্গীত এবং অন্যান্য সাধারণ সঙ্গীতকে তুচ্ছ-জ্ঞানে অবহেলা করার মধ্যেই আত্মসম্মান বোধ ও প্রতিষ্ঠা খুঁজে পান। প্রকৃত শিল্পী যিনি, তিনি কখনও কোনো শিল্পকেই অন্ত্যজ জ্ঞানে অবহেলা করতে পারেন না, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা তা আত্মপ্রবঞ্চনা। এ কথা খুবই সত্য যে সমাজের বিত্তশালী শ্রেণীই এ দেশের সঙ্গীত-রূপ সম্পদগুলিকে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা যদি লোকসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার কার্য্যেও মনোযোগী হতেন তবে

এ দেশের সঙ্গীত কলার ব্যাপক প্রসার ঘটতো—আরো বিভিন্ন ধারার সঙ্গীত হয়তো পরিবেশিত হতো, যা আজ হারিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের লোক-সঙ্গীতের মধ্যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সঙ্গেই লক্ষ্য করা গেল যে, শুধু প্রাচীন বাংলায় প্রবর্ত্তিত বাউল দরবেশের গানের গূঢ় দার্শনিকতারই যে মিল আছে তা নয়—কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতির ভাবধারাও তার মধ্যে ধরা পড়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই অবশ্য আমরা বুঝতে পারি যে এতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছুই নেই—কারণ, এই ঐক্যের গোড়াকার কথা হলো ভারতের ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য এতকাল চাপা পড়েছিল, পিছিয়ে চলেছিল কালের যাত্রা-পথে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কাছে সে ঐতিহ্যের মূল সূত্রটি ধরা পড়েছিল বলেই প্রাচীন দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর ভাবধারার কোনো অনৈক্য ছিল না। এমনি করেই আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের পুরাণো সংস্কৃতির ধারাকে, যে ধারা হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশকে বহন করে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে একদিকে তিনি যেমন নতুন সৃষ্টি-সম্ভারে আমাদের সঙ্গীত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বহু লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত সম্পদের পুনরুদ্ধার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত-সাধনা ও সৃষ্টির পথে গোঁড়ামিকে

প্রশ্রয় দেন নি, তাই তাঁর রাগসম্মত সঙ্গীতের পাশাপাশি বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালের স্থান হয়েছে। বাউলের গান সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ—বাউল ও কীর্ত্তন জাতীয় গানই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল, যদিও বাংলা-দেশের লোক-সঙ্গীতের প্রায় সব সুরেই তিনি গান লিখেছেন। "কথা ও সুর" পুস্তকে অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"বাংলা দেশের বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশী সুর পদ্ধতির সঙ্গে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাংলা দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে যোগ তাঁর খুবই নিবিড় ছিল। সেজন্য বিদেশী সভ্যতার কল্যাণে পুষ্ট স্বাধীনচিন্তা ও সৃষ্টির ধারা এই দেশের, গ্রামের পলিমাটি কেটেই বইল। মুমূর্ষু হিন্দুস্থানী দরবারী সঙ্গীতকে দেশী সুরের রক্তে সঞ্জীবিত করাতে রবীন্দ্রনাথ জীবন-ধর্ম্মেরই অনুগমন করলেন। সৃষ্টি তখনই সুন্দর হয় যখন সেটি জীবনধর্ম্মের অনুগমন করে। সহর ও দরবারের কৃষ্টি দেশের প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই ধ্বংসোন্মুখী হয়, এবং তার পূর্ণজীবনের জন্য এককালীন ঘর ও বাহির থেকে শক্তি অর্জ্জন করতে হয়, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ পুনস্থাপিত করতে হয়। এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত এবং স্মরণ রাখলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা আসবেই, তাঁর দানের মৌলিকত্বকে মর্য্যাদা দিতেই হবে। মাটির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পুনর্জীবন দান করা তাঁর

কীর্ত্তি।” বাউল গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—

“আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময় আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।……একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করে দেখি তবে দেখতে পাব যে, তাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ, কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক্ সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায়না বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয়না—স্পষ্ট

বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।"

কীর্ত্তন গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বাংলা দেশে কীর্ত্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলেনা, সে বন্ধন হোক না সোণার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক্। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপাদান সে বর্জ্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীত লোক সৃষ্টি করেছে—সৃষ্টি করতে হোলে চিত্তের বেগ এমনই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।"

এর পরে রবীন্দ্রনাথের লোকসঙ্গীত পর্য্যায়ের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির একেবারে প্রথমদিকে লোকসঙ্গীত রচনা পাওয়া যায় না—যতদূর জানা যায় ১২৯৬ সালের পৌষ মাসে রচিত "বিসর্জ্জন" নাট্যকাব্যের অন্তর্গত বাউল সুরের "আমারে কে নিবি ভাই" এই গানটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বাউল সুরের রচনা। লোক-সঙ্গীতের সুরে ব্যাপকভাবে সঙ্গীত রচনা আমরা পাই ১৩১২ সনের কাছাকাছি অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে—পরবর্ত্তী কালেও এই পর্য্যায়ের বহু গান তিনি রচনা করেছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাউল সুরের রচনা এতো বেশী যে তার সম্পূর্ণ তালিকা এর

মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়—কয়েকটি বিশিষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে—"নিশিদিন ভরসা রাখিস্" "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে" "আমারে ডাক দিল কে" "মেঘের কোলে কোলে" "হৃদয়ের একূল ওকূল" "ডাকব না, ডাকব না" "মালা হতে খসে পড়া" "পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে" "হে আকাশ-বিহারী" "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে" "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে" "আমার নাইবা হোলো" "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ" ইত্যাদি গানগুলি বাউল সুরের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কীর্ত্তন সুরের গানের মধ্যে আঁখরযুক্ত "ওহে জীবন বল্লভ" ছাড়াও "ঐ আসন তলের মাটির পরে" "প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত" "সখি, বয়ে গেল বেলা" "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" "যা হারিয়ে যায়" "না চাহিলে যারে পাওয়া যায়" ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখ-যোগ্য। রামপ্রসাদী সুরের "আমরা মিলেছি আজ" "শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা" "আমি শুধু রইনু বাকি" ইত্যাদি গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। "তার অন্ত নাইগো" "নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে" "আমার হিয়ার মাঝে" ও "আমার মন যখন জাগলি নারে" ইত্যাদি রচনাগুলির কাব্যাংশের দিক থেকে বিচার করলে এদের দেহতত্ত্ব পর্য্যায়ে ফেলা যায়। পরিবেশন-প্রণালীর বৈচিত্র্যে "ওরে বকুল পারুল" গানটিতে ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। "খরবায়ু বয় বেগে" এই গানটিতে সারি গানের প্রভাব বিদ্যমান।

"তোমার খোলা হাওয়া" "গ্রাম ছাড়া ঐ" ইত্যাদি শ্রেণীর গানকে ভাটিয়াল পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। "আমি কান পেতে রই" গানটি বাউল ও সারির সংমিশ্রণে রচিত।

স্বদেশী সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথকে কবি, দার্শনিক এবং সঙ্গীত-রচয়িতা বলেই আমরা সবাই জানি, কিন্তু এ দেশের রাজনীতিতে তিনি যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন একথা আজ অনেকে জানলেও, ভবিষ্যতে একথা হয়তো আর কেউ স্মরণ রাখবেন না। বহু ভিন্নমুখী প্রতিভার যে সমাবেশ আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই, তার বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শের কাছে ক্ষণস্থায়ী যা কিছু তার অস্তিত্ব লোপ পাবেই। আমরা জানি যে যৌবনের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ এ দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সে সময়কার রাজনীতিতে তিনি পুরোভাগেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় তাঁর লেখনী থেকে যে সব স্বদেশী সঙ্গীত বেরিয়েছে, ভারতীয় সঙ্গীতে সে সব এক নূতন ইতিহাসের সূচনা করেছে। বিশ্বভারতীর গঠনমূলক কাজে হাত দেবার পর থেকে তিনি রাজনীতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় অংশ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও, এ দেশের প্রতি রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি মত এবং আদর্শ প্রচার করেছেন। তাঁর জীবিতাবস্থার শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁর নির্দ্দেশ ও মতামত নির্ভীক কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন।

এ দেশের জাতীয়তার আন্দোলনে সঙ্গীতের ব্যবহার ব্যাপকভাবে সুরু হয় 'হিন্দুমেলার' যুগ থেকে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেও অনেকেই স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছেন ১৮৬৭ সাল থেকে। হিন্দুমেলার যুগে যে স্বাদেশিকতার আবহাওয়া রয়েছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও খুবই অল্প বয়সে—বোধ হয় তেরো চোদ্দ বছর বয়সের সময়—কয়েকটি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এই সময় থেকে ১২৯১ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সব স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছেন, সেগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং এবং সে সময়কার অনেক রচনাই আজ অশ্রুত, বা বিস্মৃত—যেমন "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ" "অয়ি বিষাদিনী বীণা" "ঢাকোরে মুখচন্দ্রমা" "একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি" "ও গান গাস্‌নে গাস্‌নে" "শোন শোন আমাদের ব্যথা" ইত্যাদি। এর পরে ১৩০০ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত রচনা যথেষ্টসংখ্যক না হলেও, এই সময়কার রচনার অন্তর্গত কয়েকটি গান বর্ত্তমানে জনপ্রিয়, যেমন "আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে" "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" "আগে চল্ আগে চল্ ভাই" "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" এই গানগুলি। এ ছাড়াও এই সময়ে রচিত "আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা" এবং "তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ" এই গান দুটি পাওয়া যায়। এই সময় থেকে বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি স্বদেশী

সঙ্গীত রচনা করেছেন তার মধ্যে "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" "জননীর দ্বারে আজি ঐ" এই দুটি গান সুপরিচিত। ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণ-মন-অধিনায়ক" এর রচনাকাল ১৩১৮ সালে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ধারার গানে লোকসঙ্গীতের সুর, বিশেষ করে বাউলের সুর যথেষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশী-সঙ্গীত রচনায় বাউলের সুর রবীন্দ্রনাথ একেবারেই গ্রহণ করেন নি যদিও পরবর্ত্তী কালে বাউলের সুরই প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়েছে। কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদী সুরের স্বদেশী-সঙ্গীত অবশ্য আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি। ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ই রবীন্দ্রনাথ অধিক সংখ্যক স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেন—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব স্বদেশী-সঙ্গীত পাওয়া যায় তার মধ্যে "বাংলার মাটি বাংলার জল" "এবার তোর মরা গাঙে" "আমার সোণার বাংলা" "ও আমার দেশের মাটি" "যদি তোর ডাক শুনে কেউ" "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে" "নিশিদিন ভরসা রাখিস্" "হে মোর চিত্ত" "দেশ দেশ নন্দিত করি" "সার্থক জনম আমার" "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক" "বুক বেঁধে তুই

দাঁড়া দেখি" "এ ভারতে রাখো" "মোদের বাঁধন যতই শক্ত হবে" "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি" ইত্যাদি গানগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

বিশেষ আশ্চর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটিও স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেন নি। এ দেশের স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস পড়লেই জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের গৃহীত কর্ম্মপদ্ধতি অনুমোদন করেন নি, এমন কি এই উপলক্ষ্যে সাক্ষাৎকালেও তিনি গান্ধীজীকে তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদ নির্ভীক ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। এই আন্দোলনের সময় থেকে বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোন স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেন নি। ১৯২৯।৩০ সালের পর থেকে অল্পসংখ্যক যে কয়টি গান পাওয়া যায় তার মধ্যে "এখন আর দেরী নয়" "শুভ কর্ম্মপথে ধরো নির্ভয় গান" "ওরে নূতন যুগের ভোরে" "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান" "সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে" "চলো যাই চলো" "খরবায়ু বয় বেগে" এই গানগুলি উল্লেখযোগ্য। "একসূত্রে বাঁধা আছি" এই গানটি কে রচনা করেছেন এ সম্পর্কে মতবিরোধ বর্ত্তমান, অনেকের মতে এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীতের কয়েকটি রচিত হয় কয়েকটি ঘটনা বা বিষয় উপলক্ষ্য করে। ১৩১২ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ

আন্দোলনের সময় ৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধনের দিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথ নগ্নপদে "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ে"র সঙ্গে শোভাযাত্রায় যোগদান করলেন এবং গাইলেন বিখ্যাত রাখী-সঙ্গীতটি "বাংলার মাটি, বাংলার জল"। রাখী-বন্ধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ আরও দুইটি স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেন, সে দুটি হলো—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে" এবং "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি"। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" রচনাটিকে স্বদেশী গান হিসাবে প্রচলিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যতদূর জানা যায় তিনি ১২৯২ সালে এটিতে সুর দেন এবং ১৩০৩ সালের কংগ্রেসে নিজে এই গানটি গেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয়-সঙ্গীত "জনগণমন" ১৩১৮ সালে রচিত হয় মাঘোৎসবের জন্য, পরে ওটি স্বদেশী-সঙ্গীতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩৩৬ সালে লাহোর জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যুসংবাদ যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছল তখন তিনি লিখলেন "সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে" গানটি। ঐ সময় শান্তিনিকেতনে "তপতী"র মহড়া চলছিল, তাই পরে এই গানটি ঐ নাটকে জুড়ে দিলেন। ১৩৩৭ সালে জাপানী যুযুৎসু পালোয়ান টাকাগাকী শান্তিনিকেতনে আসেন—যুযুৎসু-শিক্ষায় দেশবাসীকে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি কয়েকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান" গানটি প্রথমে গীত হয় "নিউ এম্পায়ারে" ১৩৩৮ সালে।

এখন ঐ গানটি নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"য় এবং স্বদেশী-সঙ্গীত, উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। "চলো যাই চলো" এই গানটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ, যখন তিনি ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য আসেন। গানটি ইউনিভারসিটী ট্রেনিং কোরের কুচকাওয়াজের উপযোগী গান হিসাবে রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীত রচনায় সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথম দিকের রচনায় তিনি যেমন রাগসম্মতভাবে সুর দিয়েছেন, তেমনি লোকসঙ্গীতের সুরও তিনি গ্রহণ করেছেন। আবার শেষের দিকের রচনাগুলি মিশ্ররাগের এবং ছন্দপ্রধান। "সার্থক জনম আমার" "আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা" "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" "এ ভারতে রাখো" ইত্যাদি গানগুলি রাগসম্মত রচনা। "আমরা মিলেছি আজ" "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" "নিশিদিন ভরসা রাখিস" "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক" ইত্যাদি গানগুলি লোক-সঙ্গীতের সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথ সেদিনের প্রচলিত কয়েকটি লোক-সঙ্গীতের সুর গ্রহণ করে কয়েকটি স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যেমন—"হরি নাম দিয়ে জগত মাতালে" এই গানটির সুরে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ," "আমি কোথায় পাব তারে" এর সুরে "আমার সোণার বাংলা" এবং "মন মাঝি সামাল সামাল" এই গানটির সুরে "এবার তোর মরা গাঙে," এই কয়টি গান।

অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে আজ ভারতবর্ষের জাতীয়-সঙ্গীত হিসাবে যে দুটি গান গৃহীত হয়েছে তার দুটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যোগ রয়েছে। "জনগণমন" গানটি ত তাঁরই রচনা এবং এতে সুরও দিয়েছেন তিনি, আর বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানটি সুরসম্মত করেছেন তিনিই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা নিজেদেরই সম্মানিত করেছি।

টপ্পা

ভারতীয় সঙ্গীতে টপ্পার আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় দুশো বছর আগে। টপ্পার প্রাচীন নাম 'ঠপ্পা' এবং রীতি হলো সংক্ষেপ সাধন। ভারতীয় সঙ্গীতে সাধারণতঃ যে চারটি 'তুক্' থাকে, টপ্পা গানে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। একটি অথবা দুইটি স্বরে স্বতন্ত্রভাবে স্বরক্ষেপণের পুনরাবৃত্তি হোলো টপ্পা পদ্ধতির অলঙ্করণ নীতির বৈশিষ্ট্য—এ ছাড়াও টপ্পা গানে তালের ব্যবহারেরও একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে টপ্পার একটা বিশেষ স্থান আছে আজকের দিনে টপ্পার বিশেষ প্রচলন না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ সেই যুগে টপ্পার বহুল প্রচলন ছিল এবং সেই কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে টপ্পার প্রভাব খুব বেশী। এই প্রসঙ্গে এটুকু বলা যেতে পারে যে টপ্পা কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র ধারা নয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান অধিকাংশ ধারার সঙ্গীত পরিবেশনে টপ্পা পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য্য। যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাধনা করেছেন এবং যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত হবেন।

সাধারণতঃ টপ্পা পদ্ধতির সঙ্গীত পরিবেশনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্মতভাবে তান ও বোলতান ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা সে শোরী মিঞার টপ্পাই হোক বা নিধু বাবু প্রবর্ত্তিত স্বতন্ত্র পরিবেশন পদ্ধতির টপ্পাই হোক। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে টপ্পা পদ্ধতির গানে তানের ব্যবহার নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তান বা বোলতান করলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়, আবার বিষ্ণুপুর-ঘরানার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি টপ্পা গানে তান, বোলতান ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের প্রকৃত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের নীতিতে পরিবেশন করে থাকেন। তর্কের খাতিরে এ দুইটি মতবাদের কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না কেননা পরিবেশন পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের কোন গানকে একেবারে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্য্যায়ে স্থান দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করতে হয়। আবার জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সে বিষ্ণুপুর-ঘরানার শিল্পীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি নিজে এই ঘরানার শিল্পীদের কণ্ঠে তাঁর গান বহুবার শুনেছেন কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা যায়নি—তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেকে এই নীরবতাকেই তাঁর অনুমোদন ও স্বীকৃতি বলে ধরে নিয়েছেন। তবে এ কথা খুবই সত্য যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রধান [illegible] হলো এর কাব্যাংশ—আর তান, বোলতান ইত্যাদির প্রাচুর্য্য ঘটলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যাংশ ক্ষুণ্ণ হতে

মাধ্য এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যরক্ষায় যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের কাছে এ ধরণের পরিবেশন শ্রুতিকটু লাগবেই। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করলেও এ কথাই প্রমাণ হয় যে তিনি সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরী, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যটুকুই গ্রহণ করেছেন মাত্র, এবং আতিশয্যকে তিনি একেবারেই বর্জ্জন করেছেন—টপ্পার ক্ষেত্রে এর কোনো-রূপ ব্যতিক্রম হয়েছে বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের টপ্পা পদ্ধতির গানে তালের ব্যবহার নিয়েও মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাব এবং সাবলীল গতি ব্যাহত হয় তালের ব্যবহারে, আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে যথারীতি বিলম্বিত লয়ের তালে টপ্পা পরিবেশন করলেই সুষ্ঠু রস-পরিবেশন করা সম্ভব। এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের টপ্পা গানে তালের ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা হয়নি—এই মতবিরোধের নিস্পত্তি ভবিষ্যতে হয়তো হবে যখন, রবীন্দ্রনাথের টপ্পা তালের সঙ্গে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্রনাথের টপ্পা গানের অধিকাংশই মধ্যমান তালে রচিত, তবে আড়াঠেকায় দুএকটি গান পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ঠুংরী পর্য্যায়ের গানের সুর সংযোজনার ক্ষেত্র কয়েকটি রাগ-রাগিণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—যেমন ভৈরবী, পিলু, খা[illegible], গারা, ঝিঁঝিট ইত্যাদি, হিন্দুস্থানী টপ্পাতেও বিশেষ কয়েকটি

রাগের ব্যবহারই দেখা যায়, যেমন কাফী, ঝিঁঝিট, ভৈরবী, সিন্ধু, খাম্বাজ ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট টপ্পা গানের সুরও এইরূপ অল্প কয়েকটি রাগ-রাগিণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের টপ্পা পদ্ধতির গানের মধ্যে "এ পরবাসে রবে কে" "কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে" "হৃদয়বাসনা পূর্ণ হলো" "বন্ধু রহ রহ সাথে" "একি করুণা করুণাময়" ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যধর্ম্মী রচনায় টপ্পাপদ্ধতির অলঙ্করণ-নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে যেমন—"আজি যে রজনী যায়" "সকল জনম ভরে" "সার্থক জনম আমার" ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিক-সঙ্গীত

এ দেশের বহু পুরাতন সভ্যতার যে ঐতিহ্য হাজার হাজার বছর ধরে মহাপুরুষরা বহন করে এসেছেন এবং সারা পৃথিবীতে প্রচার করে তার আদর্শবাদ একদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে পড়ে আমরা তা ভুলে যেতে বসেছি। বিদেশী শিক্ষার ভিতর দিয়ে যে দৃষ্টি আমরা পেয়েছি তার আত্মপ্রত্যয় নেই, আছে আত্মবিস্মৃতি। স্বীকার করি যে কাল পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সভ্যতা, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের আত্মোন্নতির যে চেষ্টা তার ফল এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির স্বাভাবিক যে সব দান আমরা পেয়েছি তার বদলে আমরা কৃত্রিম সুখ, সুবিধা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, আজকের এই দুর্দ্দিন তারই ভয়াবহ পরিণতি। বিলাসিতার প্রয়োজনে পল্লীগ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধূলিসাৎ হলো, সামাজিক ব্যবস্থা বদলে গেল—তৈরি হলো সহর, যেখানে বিলাসিতা আছে কিন্তু প্রাণস্পন্দন নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারে আজ আমরা শ্রান্ত, আজ মনে হয় যে আমাদের পূর্ব্বের সামাজিক জীবনই হয়তো ছিল ভালো। এদেশের যে কয়জন চিন্তাশীল মনীষি পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভয়াবহ ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাঁরাই

এ দেশের পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থায় শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এই কারণেই গান্ধীজী আশ্রমজীবনের প্রতিষ্ঠা করলেন সেবাগ্রামে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পুরাতন আশ্রমিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক আদর্শ পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হলেন।

এমন একদিন ছিল এদেশে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবন ছিল উৎসব-বহুল। আজকের মতো আমাদের সামাজিক জীবনে এত লৌকিকতা ছিল না, ছিল নানা উৎসব, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মনের আদান প্রদান। সামাজিক নিয়ম, বিধিনিষেধ ছিল যেমন প্রচণ্ড—দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল তেমনি স্বাভাবিক। নানা উৎসব, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনের যত আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম। এ দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক ভৌগোলিক, শাসন-তান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতার ঐতিহ্য আমরা পুরুষানুক্রমেই বহন করে এসেছি। দুশো বছর আগে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এসেছিল তার প্রভাবে আমাদের অতিপুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা হলো ধূলিসাৎ, এল কূট রাজনীতি, শিল্পসম্প্রসারণ আর সেই সঙ্গে জীবনধারণের বহুবিধ সমস্যা। বৈজ্ঞানিক শিল্পে যদি এ দেশকে সমৃদ্ধশালী করা যেত তবে আপত্তি ছিলনা কিন্তু কোথায় সে সম্পদ যা পাবার জন্য আমরা নিজেদের দেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিসর্জ্জন দিয়েছি?

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারে দেশের তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রীভূত হল সহরে, যেখানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানেই মানুষ ব্যস্ত—গতানুগতিক একটু আধটু লৌকিকতা ছাড়া উৎসব, অনুষ্ঠান উপভোগের আর সময় কোথায়! সামান্য যা কিছু উৎসব, আনন্দ তা হয়েছে ধনীর বিলাসিতা, দেশের প্রাণশক্তি পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে—সামাজিক জীবনের প্রতি পদে যে আনন্দপূর্ণ পরিবেশ দেখা যেত আর কি তা ফিরে আসবে?

আমাদের আচার অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার থেকে লৌকিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী, তাই এই সব অনুষ্ঠানে কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে। এই কৃত্রিমতা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য এসে পড়েছে। বর্ত্তমান যুগের জীবন নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলেছে একথা খুবই সত্য, কিন্তু তার মধ্যেও যেটুকু সামান্য সময় থাকে তার সদ্‌ব্যবহার আমরা করি না। আর্থিক কারণে আনন্দময় পরিবেশ নষ্ট হয়না, পরিমাণের দিক থেকে কিছুটা রদ্‌বদল হতে পারে মাত্র। আসল কথা আমরা আমাদের আনন্দপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে ঠেলে ফেলে, অনুকরণ করবার চেষ্টা করছি এমন একটা বিদেশী সমাজ-পদ্ধতিকে যার সঙ্গে আমাদের মনের মিল নেই—তাই এর মধ্যে যে কৃত্রিমতা, যা চাকচিক্য তা ক্ষণস্থায়ী। দেশের হাওয়া আজ বদলেছে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

যে রুচিবোধ জাগ্রত হবে তার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে পাব প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানের ধারা, গ্রামে ও সহরে আবার ফিরে আসবে সেই আনন্দময় পরিবেশ যার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এ দেশের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতরূপ সম্পদগুলি। এ দেশের বিভিন্ন লোক-সঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছিল আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে ঘিরেই—সে অনুষ্ঠানও আজ নেই, সেই সব সঙ্গীত-সৃষ্টিও আজ অবহেলিত—কিন্তু দেশের সঙ্গীতরূপ সম্পদ অবহেলার বস্তু নয়। সঙ্গীত আমাদের আচার অনুষ্ঠানের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক-সঙ্গীত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারব।

পৌরাণিক ও ইতিহাসের পুঁথিতে আমরা আশ্রমজীবন ও সমাজের যে বিবরণ পাই তার মধ্যে সঙ্গীতের একটা বিশেষ স্থান আছে। ভারতীয় সঙ্গীত কেবলমাত্র রস-পরিবেশনের জন্যই ব্যবহৃত হয় না, আমাদের আচারে, উৎসবে বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমরা তার রস উপভোগ করতে অভ্যস্ত। শাস্ত্রসম্মত রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি পর্য্যালোচনা করলেও আমরা এই প্রমাণই পাব। দেবদেবীর পূজা ও প্রার্থনা এ দেশের একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—সাধকদের অন্তর থেকে এই সব প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে যেসব সঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছে তাই আজ এ দেশের মার্গসঙ্গীত। আনুষ্ঠানিক

সঙ্গীত থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল, দেবদেবীর অর্চ্চনা ও রাজবন্দনার প্রয়োজনেই ধ্রুপদ, টপ্পা প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছে—তাই সামাজিক অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজনেই এ দেশের সঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছে এ কথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবেনা।

শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক জীবনের নানা অনুষ্ঠানের উপযোগী বহু সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, বর্ষশেষ, নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, শিল্পোৎসব ইত্যাদি নানা আশ্রমিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনায় স্থান পেয়েছে। উপরোক্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও শান্তিনিকেতন আশ্রমের কয়েকটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত কয়েকটি গান আমরা পাই—দোলযাত্রার দিনে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে নৃত্যগীত সহযোগে একটি শোভাযাত্রার জন্য রচিত হয়েছে—"ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল" গানটি। শরৎ-ঋতু আবাহনের জন্য ১লা আশ্বিন গীত হয়—"আমার নয়ন ভুলানো এলে" গানটি। বসন্ত-ঋতুর বন্দনার জন্য ১লা ফাল্গুন গাওয়া হয় "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে" অথবা "আজি দখিন দুয়ার খোলা"। প্রতিদিন আশ্রমিক জীবনের কার্য্যারম্ভ হয় প্রভাতী বৈতালিক সঙ্গীত হিসাবে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত দিয়ে—প্রতি বুধবার মন্দিরের বিশেষ

উপাসনার দিনে প্রভাতে কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্গীত হয়। অনেক সময় মনে হয় যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই যে বিরাট ভাণ্ডার সৃষ্ট হয়েছে, আশ্রমিক উৎসব অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সঙ্গীত রচনার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে, নইলে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র সঙ্গীত রচনার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় আড়াই হাজারের মতো সঙ্গীত রচনার সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণেই কমে যেত। শান্তিনিকেতনে বিদ্যাভ্যাস এবং বিবিধ জ্ঞান সঞ্চয়নের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটা আনন্দপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে রবীন্দ্রনাথ কতটা চেষ্টিত ছিলেন তার পরিচয় আমরা শান্তিনিকেতনের বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। এ দেশের বিদ্যায়তনগুলির পাঠক্রম এবং শিক্ষাদান কার্য্য এমন এক স্তরে এসে পৌঁচেছে যেখানে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া এবং কৃতিত্ব-পত্র সংগ্রহই হয়েছে শিক্ষার্থীদের একমাত্র উচ্চাশা—স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বা চরিত্র বিকাশের কোনো ব্যবস্থা বা সুযোগ এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় নেই।

সামাজিক প্রয়োজন ছাড়াও প্রকৃতির বন্দনা এবং বর্ণনার প্রয়োজনে রচিত সঙ্গীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেছেন তা নূতন এবং চিরনূতনই থাকবে। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং সঙ্গীত সৃজন-প্রতিভার মিশ্রণ ঘটেছে। কৃত্রিম বিলাসিতা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষায় আমরা

প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি, ভুলে যেতে বসেছি যে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বল প্রকৃতিরই প্রসাদ। শান্তিনিকেতনে ১৯৩৯ সালের 'হলকর্ষণ' উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করা হলো। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি যে অবহেলা আমরা করে থাকি তার প্রতিবাদে তিনি বললেন—"পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগলো। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্ব্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্য্যাবর্ত্ত আজ তাই খরসূর্য্যতাপে দুঃসহ।

"এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্ত্তৃক মাতৃ-ভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব। আজকের অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাবনিকাশের উপলক্ষ্যে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নবস্ত্রে একত্র হবার যে-বিদ্যা, মানব-সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষি-বিদ্যার প্রথম উদ্বোধনে আনন্দ-স্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।" প্রকৃতির বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি

সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেছেন, এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত রচনা করেছেন তা আজকে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি অংশ বলে পরিগণিত হলেও একদিন আমাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বলেই গণ্য হবে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং বিশেষ করে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় শুনেছি যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনে যত শোক, দুঃখ, আনন্দ পেয়েছেন, সঙ্গীতের মাধ্যমেই তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং শান্তি খুঁজেছেন—দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির প্রধান উৎসস্থল।

এর পরে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক এবং মাঙ্গলিক উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার একটি তালিকা তুলনামূলকভাবে দেওয়া হলো—

জন্মোৎসবের গান— ১। হে নূতন, দেখা দিক আরবার
২। তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
৩। হে চিরনূতন
৪। ভয় হতে তব অভয় মাঝে

বিবাহের গান— ১। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ
২। দুই হৃদয়ের নদী
৩। প্রেমের মিলন দিনে
৪। শুভদিনে এসেছে দোঁহে

৫। সুমঙ্গলী বধূ
৬। দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

মৃত্যুদিনের গান— ১। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
২। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে
৩। সমুখে শান্তিপারাবার
৪। ঐ মরণের সাগর পারে

বর্ষশেষের গান— ১। আঁধার এল বলে
২। বর্ষ গেল, বৃথা গেল
৩। দিন অবসান হলো

নববর্ষের গান— ১। এসো হে বৈশাখ
২। ওরে নূতন যুগের ভোরে
৩। জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয়

গৃহপ্রবেশের গান— ১। এসো হে গৃহদেবতা
২। ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি
৩। হৃদি মন্দির-দ্বারে বাজে

বৃক্ষরোপণের গান— ১। আয় আমাদের অঙ্গনে
২। মরুবিজয়ের কেতন উড়াও
৩। ফুল বলে ধন্য আমি

হলকর্ষণের গান— ১। আমরা চাষ করি আনন্দে
২। ফিরে চল মাটির টানে

শিল্পোৎসবের গান— ১। নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র
২। সব কাজে হাত লাগাই মোরা

হাস্যরসাত্মক গান

বাংলা দেশে কমিক্ বা হাস্যরসাত্মক গান যথেষ্ট শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই সব গানের কথা এবং সুর আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। সংবাদপত্রে কার্টুন যেমন রসপরিবেশনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে সমালোচক ও সংস্কারকের কাজ করে, তেমনি হাস্যরসাত্মক গানের মধ্য দিয়েও নানা কুসংস্কার, অব্যবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জন-সাধারণকে সচেতন করে তুলতে পারা যায়; এ ছাড়া এই সব গানের নিছক রস-পরিবেশনের তাৎপর্য্য ত আছেই। দেখা যায় যে অন্যান্য দেশে ছায়াছবির গান বা নাটকের মধ্য দিয়ে নিখুঁত হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে এবং তাদের বিষয়বস্তুর প্রয়োগ-নৈপুণ্য এতো উন্নত ধরণের যে সবাই তাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। আমাদের দেশে হাস্যরসাত্মক রচনা ভাল যে নেই তা নয়, কিন্তু তার অধিকাংশই মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন নয়। সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে কোনো প্রসিদ্ধ গান অথবা প্রচলিত কোন ছায়াছবির গানের সুর অনুসরণ করা যেন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের হাস্যরসাত্মক গানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও মার্জ্জিত রুচিবোধ আনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলা ভাষায় সব চেয়ে বেশী হাস্যরসাত্মক গান রচনা

করেছেন বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল। রসরাজ অমৃতলাল বসুর বিভিন্ন নাটকেও বহু হাস্যরসাত্মক-সঙ্গীত পাওয়া যায়। এই সব রচয়িতাদের গান পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তার অধিকাংশই রচিত হয়েছে আমাদের সামাজিক কুসংস্কার ও অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের প্রতি কটাক্ষ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে বিদ্রূপ করেও বহু হাস্যরসাত্মক রচনা লেখা হয়েছিল এ প্রমাণ পাওয়া যায়। হাস্যরসাত্মক গানে জনসাধারণকে আকর্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ তাই এই সব গানের মধ্য দিয়ে সমালোচনা বা প্রতিবাদ জানালে তা অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে পারে। পল্লী-গ্রামে কবিয়ালদের লড়াইর মধ্যেও যে সব ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায়, তার ফলে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে সে যুগে হাস্যরসাত্মক গান সমালোচকদের কাজ করেছে—তার মধ্যে গঠনমূলক আদর্শও যেমনি থাকত, রসপরিবেশনের দিক থেকে তেমনি ছিল তাদের যোগ্যতা—অবশ্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধ যে জাগ্রত হবে একথা মনে রেখেই সেদিনের কথা ভাবতে হবে। আজকাল ছায়াছবিতে, রেকর্ডে ও সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলিতে যে সব হাস্যরসাত্মক গান পরিবেশন করতে শোনা যায়, কাব্যাংশে তার যেমন না আছে কোনো আদর্শ তেমনি সুর-সংযোজনায় সেগুলি নিতান্তই নিম্নশ্রেণীর।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত-রচনার অধিকাংশই বিভিন্ন নাটকের জন্য রচিত। কালমৃগয়া ও বাল্মিকী প্রতিভার

"আঃ বেঁচেছি এখন", "প্রাণ নিয়েত সট্‌কেছিরে" "ঠাকুর মশাই দেরী না সয়" ইত্যাদি গানগুলি, 'গোড়ায়-গলদে'র "যার অদৃষ্টে যেমনি", 'বিনি-পয়সায় ভোজ' কৌতুকনাট্যের "যদি জোটে রোজ", 'ফাল্গুনী'র—"ভাল মানুষ নইরে মোরা" "আমাদের পাক্‌বেনা চুল গো", 'রাজা রাণী'র "যমের দুয়ার খোলা পেয়ে", ইত্যাদি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। "তাসের দেশ" গীতিনাট্যে কয়েকটি নাটকোপযোগী রচনা আছে যেগুলি হাস্যরসাত্মক সঙ্গীতের পর্য্যায়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনে ১৯৩৫ সালে একটি সংঘ গঠিত হয়েছিল, যার সদস্যদের কাজই ছিল হৈ চৈ করা—কাজের সঙ্গে নামের সঙ্গতি বজায় রাখবার জন্য এই সংঘের নামকরণ করা হয় "হৈ হৈ সংঘ" এবং রবীন্দ্রনাথ এই সংঘের জাতীয়-সঙ্গীত হিসাবে রচনা করে দেন "কাঁটাবন বিহারিণী সুরকাণা দেবী" গানটি। এই গানটি ছাড়াও এই সংঘের জন্য "পায়ে পড়ি, শোনো ভাই গাইয়ে" "না গান গাওয়ার দলরে মোরা" ইত্যাদি গানগুলি রচিত হয়। স্বতন্ত্র রচনা হিসাবে "ও ভাই কানাই" "মোদের কিছু নাইরে নাই" "ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি" ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের চা-পানের জন্য যে চা-চক্রটি নির্ম্মিত হয়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ তা'র নামকরণ করেন "দিনান্তিকা"—এই উপলক্ষ্যে রচিত "চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল হে" এই গানটিকে হাস্যরসাত্মক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

হিন্দি-ভাঙ্গা ও গৎ-ভাঙ্গা গান

হিন্দুস্থানী গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব রচনা করেছেন অনেকের মতে এগুলি অনুকরণ-দুষ্ট। কিন্তু এই ধারণার মূলে যে কোন যুক্তি বা সত্যতা নেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে "বিদেশী সুরের গান" শীর্ষক অধ্যায়ে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান সতেরোটি বিভিন্ন ধারার রচনা পর্য্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই সতেরোটি বিভিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদা এই সব বিভিন্ন ধারার রচনার মধ্যে বিজাতীয় করে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এ ছাড়াও খেয়াল পর্য্যায়ের বহু হিন্দিভাঙ্গা রচনার গঠন বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ নানা সংস্কার সাধন করেছেন। চার লাইনের মূলগান ভেঙ্গে চারটি তুক্ সমেত ১২।১৪ লাইনের পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত রচিত হয়েছে, এই পর্য্যায়ের গানে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সুরবিন্যাসের ক্ষেত্রেও মূলগানের অলঙ্কার-বাহুল্য বর্জ্জন করে রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেক গান মার্জ্জিত রূপ পেয়েছে, এর পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের হিন্দি-ভাঙ্গা গান পরিবেশন কালে একটা কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, তা হলো এই যে এই সব গান হিন্দি গানের

সুর নিয়ে রচিত হলেও তা যেন বিজাতীয় আদর্শে পরিবেশিত না হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করছি, হিন্দুস্থানী গান নয়। হিন্দি গানে কাব্যাংশের কোনো মর্য্যাদা নেই, সুরবিন্যাসের প্রয়োজনেও অনেক ক্ষেত্রে আতিশয্যের জন্য এই সব গানের কাব্যাংশ নিমিত্ত মাত্র হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যাংশ অবহেলার বস্তু নয়। এই কাব্যাংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই মূলগানের সুর ও রাগ-রাগিণীর উপাদান মাত্র গ্রহণ করে অলঙ্কারের আতিশয্য বর্জ্জন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে বাল্যকালে একটা সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যকালে তিনি বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী ইত্যাদি সে যুগের প্রখ্যাত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-শিল্পীকে পেয়েছিলেন পারিবারিক শিক্ষকরূপে, তাই তাঁর মনের মধ্যে হিন্দুস্থানী গানের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই জাগ্রত হয়েছিল এবং তাঁর প্রথম যুগের রচনায় এই জন্যই হিন্দুস্থানী গানের প্রভাব খুবই বেশী। তবে 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' ও 'গীতলিপি' পুস্তকে এবং সে যুগের 'বীণাবাদিনী', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি পত্রিকায় এই সব পর্য্যায়ের গানের যে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি হিন্দুস্থানী মূলগানগুলির বাঁধুনী ও রাগ-রাগিণীর উপাদান মাত্র গ্রহণ করে বাংলায় নিজস্ব রচনায় চেষ্টিত

হয়েছিলেন। পরিবেশন রীতি ও নীতির বিচারে এই সব গান বিষ্ণুপুরী ঘরানার অন্তর্গত তাই আজও রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পরিবেশনে বিষ্ণুপুরী গায়কীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দিভাঙ্গা গানের মধ্যে আমরা হিন্দি ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, তেলেনা ও ভজন গানের সুর নিয়ে রচিত গানের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের এই পর্য্যায়ের গানের রচনাকাল ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কাব্যাংশের দিক থেকে বিচার করলে হিন্দিভাঙ্গা গানের অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীত পর্য্যায়ে পড়ে যদিও কয়েকটি গান ঋতু-সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। হিন্দিভাঙ্গা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সংখ্যা একশ' পঞ্চাশের কিছু বেশী। এই পর্য্যায়ের কয়েকটি গানের একটি তালিকা প্রকাশ করা হলো—

হিন্দি-ভাঙ্গা গান (ধ্রুপদ ও ধামার)—ধ্রুপদ ও ধামার রচনার সংখ্যা পঞ্চাশের থেকে বেশী। এই পর্য্যায়ের কয়েকটি গান—

রবীন্দ্রনাথের গান	মূলগান	রাগ/তাল
আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা	বহুর রঙ্গাও বংশী,	পূরবী, তেওড়া
আজি বহিছে বসন্ত পবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন,	বাহার, তেওড়া
আজি মম মন চাহে	ফুলি বন ঘন ঘোর,	বাহার, চৌতাল
আমারে করো জীবন দান	ইয়া জগ ঝুট,	শঙ্করা, চৌতাল
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী,	বৃন্দাবনীসারং, তেওড়া

তাঁহারে আরতি করে	জগজন ধ্যান ধরত,	বড়হংসসারং, চৌতাল
পান্থ এখনো কেন	বঙ্গ যুগত সোঁ। গাবে বজাবে	ললিত, সুরফাক্তা
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদি শিবশক্তি	দীপক পঞ্চম, সুরফাক্তা
বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতুপতি	বাহার, সুরফাক্তা
বাণী তব ধায় অনন্ত	বেণী নিরখত ভুজঙ্গ,	আড়ানা, চৌতাল
শুভ্র আসনে বিরাজো	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন,	ভৈরোঁ, আড়া চৌতাল
সুন্দর বহে আনন্দ	শঙ্কর শিব পিনাকী,	ইমন কল্যাণ, সুরফাক্তা
জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে	আজু রঙ্গ খেলত হোরী,	বেহাগ, ধামার
বীণা বাজাও হে	বীণ বাজাইরে রে,	পূরবী, ধামার
সুধা সাগর তীরে	আয়ো ফাগুন বঢ়োমান,	নায়কী কানাড়া, ধামার

হিন্দি-ভাঙ্গা গান (খেয়াল)—রবীন্দ্রনাথের এই পর্য্যায়ের রচনার সংখ্যাও পঞ্চাশের বেশী। এই পর্য্যায়ভুক্ত কয়েকটি গান—

আঁখিজল মুছাইলে জননী	জিন ছুঁয়ো মোরে	রামকেলি, ত্রিতাল
আজি কমলমুকুলদল	মনকী কমলদল	বাহার, ত্রিতাল
আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ, ত্রিতাল
এসো শরতের অমল মহিমা	বাজে ঝনন ঝনন বাজে	জৌনপুরী, ত্রিতাল
কোথা যে উধাও হলো	বোল রে পাপিয়ারা	মিঞামল্লার, ত্রিতাল
ডাক মোরে আজি	ক্যা করু ন মানেরি	পরজ, ত্রিতাল

ডাকে বার বার ডাকে — মোহে কৈসে নিকিলাগি কেদারা, ত্রিতাল
তিমিরময় নিবিড় নিশা — প্রবলদল মেঘ — মেঘ, ঝাঁপতাল
দাও হে হৃদয় ভরে দাও — প্যালা মুঝে ভরি দেরে
রামকেলি, ত্রিতাল
নয়ান ভাসিল জলে — পাপিহা বোলেরে — শ্যাম, একতাল
বিমল আনন্দে জাগোরে — সো নহি মারেঙ্গে — গান্ধারী, ত্রিতাল
মন্দিরে মম কে — সুন্দর লাগি রহে — আড়ানা; একতাল
মোরে বারে বারে ফিরালে — মোরি নয়ি লগন লাগি রে
নটমল্লার, একতাল
স্বপন যদি ভাঙ্গিলে — রামকেলি, একতাল
হৃদয় নন্দন বনে — উড়ত বন্দন নব — বসন্তপঞ্চম, ঝাঁপতাল

হিন্দি-ভাঙ্গা গান (অন্যান্য)—ধ্রুপদ ও খেয়াল পর্যায়ের রচনা ছাড়াও হিন্দুস্থানী টপ্পা, ঠুংরী ও তেলেনা সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করেছেন, তার তালিকা নীচে দেওয়া হলো—

রবীন্দ্রনাথের গান	মূলগান	রাগ/তাল
আইল আজি প্রাণ সখা	খোল তব ঘুঁঘট পট (টপ্পা)	কেদারা, আড়াঠেকা
এ পরবাসে রবে কে হায়	এ মিঞা বেজন্মুওয়ালে (টপ্পা)	সিন্ধু, মধ্যমান
ঐ মোহ আবরণ খুলে দাও	ঘুঁঘট পট খোলি (টপ্পা)	ইমন, আড়াঠেকা
কে বসিলে আজি	বে পরিয়া তাঁড়ে (টপ্পা)	সিন্ধু, মধ্যমান

দিন যায় রে দিন (টপ্পা)   পিলু, মধ্যমান
নিশিদিন চাহ রে   আজু মনভাবন (টপ্পা)
যোগীয়া, আড়াঠেকা
হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো   মিয়া বে মাহ্নলে   ঝিঁঝিট মধ্যমান
খেলার সাথী বিদায়দ্বার   মহারাজা কেবড়িয়া (ঠুংরী)
তুমি কিছু দিয়ে যাও   কৈ কছু কহরে (ঠুংরী)
অহো আস্পর্দ্ধা একি   দারাদ্রিম তা না (তেলেনা)
বেহাগ, ত্রিতাল
ঐ পোহাইল তিমির রাতি   তোমতানা নানা নানা (তেলেনা)
আলাইয়া, ত্রিতাল
চরাচর সকলি মিছে মায়া   দারাদ্রিম্ নানা নানা (তেলেনা)
বেহাগ, ত্রিতাল
সুখহীন নিশিদিন   দারাদ্রিম্ দারাদ্রিম্ (তেলেনা)
নটমল্লার, ত্রিতাল
কখন দিলে পরায়ে   কিন্হে দেখা কান্হাইয়া (মীরার ভজন)

গৎ-ভাঙা গান—যন্ত্র সঙ্গীতের গৎ এর সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেছেন তা হলো—

এস শ্যামল সুন্দর—দেশ, ত্রিতাল
মোর ভাবনারে কি হাওয়ায়—দেশ, ত্রিতাল

রাগসঙ্গীত

রাগসঙ্গীত পর্য্যায়ের গানের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হলে খেয়াল, ঠুংরী, ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, এই সব ধারার গান নিয়ে আলোচনা করতে হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় ধ্রুপদ, ধামার ও টপ্পা পদ্ধতির গানের অস্তিত্ব এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এই সব ধারার গানকে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। কাজে কাজেই রবীন্দ্রনাথের কেবলমাত্র খেয়াল ও ঠুংরী পর্য্যায়ের রচনা নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের হিন্দীভাঙ্গা গানের পরিসরও এত বিস্তৃত যে ঐ ধারার রচনাকেও একটা স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র পনেরো বছর আগেও শোনা যেত যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাল নেই, রবীন্দ্রনাথের গান শাস্ত্রসম্মত নয়—এই অভিযোগ যে নিতান্তই ভিত্তিহীন আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান কেবলমাত্র যে শাস্ত্রসম্মত তাই নয়, তাল ও রাগ-রাগিণীর উপাদানকে এতো ব্যাপক ভাবে বাংলা ভাষায় আর কোনো সুরকার ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়না। তবে এ কথাটা খুবই সত্য যে নিছক রাগবিন্যাসের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তিনি সঙ্গীত-রচনা করেন নি। গানের কথা, সুর ও ভাব—এই তিনের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এই খানেই

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে এর পার্থক্য। আজকাল যে সব রাগ-রাগিণীর উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পরিবেশন ইতস্ততঃ শুনতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের গানে সেই সব রাগ-রাগিণীর অধিকাংশই ব্যবহৃত হয়েছে এবং শাস্ত্রসম্মত ভাবেই তার ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি প্রচলিত রাগ-রাগিণী ছাড়াও বহু লুপ্তপ্রায় এবং কূট রাগের রচনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনায় আমরা দেখতে পাই যে তাঁর প্রথমদিককার রচনায় রাগসম্মত সঙ্গীতই অধিক, ক্রমশঃ মিশ্র রাগের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শেষের দিকের রচনা একটা ভিন্নতর রূপ পেয়েছে।

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে যে রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের চর্চ্চা বিশেষভাবে না করেই রাগ-রাগিণীর উপাদান নিয়ে এতো বিভিন্ন ধরণের রাগসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন কি ভাবে! রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চ্চা ও প্রচলন ছিল খুবই বেশী। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদু ভট্ট, রাধিকা মোহন গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিত্র ইত্যাদি সেযুগের প্রতিভাবান সঙ্গীত-শিল্পীদের আনাগোনাও ঠাকুর-পরিবারে যথেষ্ট ছিল। সে যুগের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের অনেকেই। তবে এ কথা জানা যায় যে, বস্তুতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে এবং উৎসাহেই রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত অল্পবয়সেই সঙ্গীত-রচনায় মনোনিবেশ

করেছিলেন, অবশ্য পারিবারিক সাঙ্গীতিক আবহাওয়া এইজন্য তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"বাঙ্গালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকাল সন্ধ্যায় উৎসবে, আমোদে, উপাসনা-মন্দিরে তার গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তার কাছে গান চর্চ্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়।......... আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।......আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠ বাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। স্ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতারে, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করতো, গান ধরতেন— 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী'—সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না। ......ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙ্গালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে

রাজমর্য্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই বিখ্যাত যতুভট্ট। তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। যতুভট্টের মতো সংগীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। ......রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশী। ......ছেলে বেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল...... কালোয়াতি সংগীতের রূপ ও রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল...ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে......অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই সব লেখা থেকেই জানা যায় যে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত তাঁর বাল্যকালে তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার সঙ্গীত-রচনায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রভাবের কারণ সম্পর্কেও একটা সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় যে সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার সঙ্গীত-রচনায় সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রেও যে তাঁরা প্রভাববিস্তার করেছিলেন এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা থেকে, এবং এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন আজও দেখি যে বিষ্ণুপুরী ঘরোয়ানার উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি গান পরিবেশন করেন একেবারে স্বতন্ত্রভাবে, ঠিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পরিবেশন প্রণালীতে যদিও রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীরা সেই সব গানই গেয়ে থাকেন সঠিক রবীন্দ্র-সঙ্গীতরূপে এবং প্রকাশিত স্বরলিপি অনুযায়ী।

একটা কথা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপাদান গ্রহণ করেছেন মাত্র। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির প্রধান পার্থক্য হলো এই যে তিনি রাগ-রাগিণীকে কেবলমাত্র সাঙ্গীতিক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। একাধারে স্বভাব-কবি ও সুরকার হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সুরবিন্যাসের আদর্শ নিয়ে যে সব বিশ্লেষণ করেছেন

তা থেকেও বোঝা যায় যে রাগবিন্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যবোধই ছিল প্রবল। বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা……ভৈরোঁ যেন ভোরবেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ। ……রামকেলি প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিকে বাষ্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্ছে ……… মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস।…… পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।… … আজকের এই দিনটা সেই রকমের—এ আছে তবু নেই,—এ গৌড়সারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোন অঙ্ক রেখে যাবে না। …… বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি, থাম্ রে থাম্, আয় রে আয়। …… পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।… … সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই তাই আমাদের বিবাহ-উৎসবের রাগিণী …… কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি। …… খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।"

রবীন্দ্রনাথের রাগসঙ্গীতে প্রধানতঃ দুরকমের রচনা লক্ষ্য করা যায়। একক রাগ-রাগিণীর সুর নিয়ে যে সব গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তা হলো এর একটা দিক, আর অন্যদিকে হলো রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মিশ্ররাগের ব্যবহার। একক রাগ-রাগিণীর সুরে রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন প্রথমে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব। তবে এই দ্বিবিধ রচনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাগসম্মত সঙ্গীত রচনার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা দেওয়া হলো—

"আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিষ আছে, একটা হচ্ছে গানের তত্ত্ব, আর একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন করে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে। দেশ কাল পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য—তাকে প্রশংসা করব কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশ কাল পাত্রে হুঁচট খেয়ে সত্য হারাবে। ......এ কিন্তু অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিষ্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্ত্তা দরবারী, তোড়ি, কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন

সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তি মাত্র নয়।······ হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানিনে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই ; ঐখানে হাতকড়িপরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র, এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্দ্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম······আমরা শাসন মানব, তাই বলে অত্যাচার মানব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাইরের জিনিষ নয়, তা বিশ্বের বলেই তা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তা আমার ভিতরে নেই, বাইরে আছে ; সুতরাং তাকে অভ্যাস করে বা ভয় করে বা দায়ে পড়ে মানতে হয়। এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা থেকে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকবে।"

অতএব বোঝা গেল যে কেন তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আতিশয্যকে বর্জ্জন করেছেন। রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায় এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গীতের কাব্যাংশকে

স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করেছেন মাত্র, অলঙ্করণের আতিশয্যকে এই একই কারণে তিনি গ্রহণ করেন নি—তাই তানবিস্তারের প্রাবল্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। অথচ দেখা যায় যে শাস্ত্রগতভাবে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী পরিবেশনের জন্য যে সব সময়কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই নির্দ্দেশকে যথাযথভাবেই গ্রহণ করেছেন, তালের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর রাগসম্মত সঙ্গীত-রচনায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ক্ষেত্রে যে সব তাল ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে গ্রহণ করে প্রচলিত রীতি ও নীতি স্বীকার করে নিয়েছেন।

ইমন, বেহাগ, কেদারা, ছায়ানট, কানাড়া, ভৈরবী ইত্যাদি রাগ-রাগিণী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ এই সব রাগিণীর কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যায়—ইমনের সুরে "হে মোর দেবতা" (একতাল), "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা" (একতাল), বেহাগে "তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে" (ত্রিতাল), "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে" (ত্রিতাল), কেদারায় "ডাকে বারবার ডাকে" (ত্রিতাল), "প্রভু আমার, প্রিয় আমার" (একতাল), "সীমার মাঝে অসীম তুমি" (একতাল), কানাড়ায় "এবার নীরব করে দাও হে" (দরবারী—ঢিমা ত্রিতাল), "নাথ হে প্রেম পথে" (সুহা—ত্রিতাল), "শুনি ঐ রুণুঝুণু পায়ে" (দরবারী-যৎ), ভৈরবী সুরের "অন্তর মম বিকশিত কর" (একতাল), "ঐ রে

তরী দিল খুলে" (রূপক্‌ড়া), "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ" (একতাল) ইত্যাদি গানের সুর পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সব গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন শাস্ত্রসম্মতভাবেই, অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো অলঙ্কারবহুল করে তাদের তিনি বিজাতীয় করে তোলেন নি। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আজকাল যে সব রাগ-রাগিণী সচরাচর পরিবেশন করতে শোনা যায় তার প্রায় সবগুলিই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে,—অন্যান্য রাগ-রাগিণীর সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার মধ্যে "অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে" (খাম্বাজী টোড়ি), "কোথা যে উধাও হলো" (রবি-মল্লার), "রজনীর শেষ তারা" (টোড়ি), "ওগো স্বপ্ন-স্বরূপিণী" (পরজ), "কার বাঁশী নিশিভোরে" (জৌনপুরী), "এসো শরতের অমল মহিমা" (আশাবরী), "চিত্ত পিপাসিত রে" (খাম্বাজ), "কার মিলন চাও বিরহী" (শ্রীরাগ), "নয়ান ভাসিল জলে"—(শ্যাম), "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে" (ভৈরোঁ), "আমারে যদি জাগালে" (গৌড়-মল্লার), "মোরে বারে বারে" (নটমল্লার), "আজি কমল-মুকুলদল খুলিল" (বাহার), "ঝর ঝর বরিষে বারিধারা" (মিঞা-মল্লার), "ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে" (পরজ), "আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে" (মালকোষ), "অন্ধজনে দেহ আলো" (ধূন্), "আজি প্রণমি তোমারে"

(বিভাস), "মন্দিরে মম কে" (আড়ানা) ইত্যাদি গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একক রাগ-রাগিণী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ রাগমিশ্রণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অনেক বেশী। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রাগমিশ্রণ দেখা যায় দুই প্রকারের, একটি ইচ্ছাকৃত এবং অপরদিকে কতক-গুলি গানে রাগমিশ্রণ হয়েছে অনেকটা অজ্ঞাতসারেই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের সঙ্গীতরচনায় রাগমিশ্রণের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা শাস্ত্রসম্মত এবং সে সময়ের গানে দুইটির অধিক রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটেছে বলে দেখা যায় না—আবার রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সঙ্গীত রচনায় একই গানে নানা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর অজ্ঞাতসারেই, এবং বহুক্ষেত্রে এমন সব মিশ্রণ হয়েছে যার প্রয়োগ ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় সঙ্গীতে আর দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের রচনায় গানের কথার অংশ, এতে ভাব অপেক্ষা শাস্ত্রনিষ্ঠা প্রবল; কিন্তু শেষের দিকের সঙ্গীত-রচনায় সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে গানের কথা ও ভাব, শাস্ত্র অপেক্ষা প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী। সুর-সংযোজনার দিক থেকে বিচার করলে সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে দুভাগে ভাগ করা যায়। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯১১।১২ সাল পর্য্যন্ত রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গানই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্য্যায়ের এবং এই সময়ের গানে সেই সময়কার রীতি অনুযায়ী যে সব রাগ-রাগিণীর

মিশ্রণ ঘটেছে তাকে অনুকরণ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে কেননা প্রচলিত এবং সঙ্গীত সমাজে স্বীকৃত মিশ্ররাগের ব্যবহারই এই সময়কার গানে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯১২ সাল থেকে এবং বিশেষ করে "গীতাঞ্জলি" "গীতিমাল্য" ও "গীতালি" ইত্যাদি রচনার পর থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত রচিত গানের পর্য্যালোচনা করলে বেশ সহজ ভাবেই বোঝা যায় যে, এই সময় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের বাঁধাধরা গঠন পদ্ধতির আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে আপন সাহিত্য-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি, কাজে কাজেই এই সময়ের গানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীত-প্রতিভাব মিলন ঘটলো। রাগ-বিন্যাস বা নানাবিধ তালের প্রয়োগ না করে সোজাসুজি ভাবে গানের কথার ভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট করতে এই সময় যেসব রাগমিশ্রণ ঘটলো তা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রসারের দিনে সঙ্গীত-সমালোচকদের তাঁর এই সব সৃষ্টিকে জানতে হবে এবং স্বীকার করে নিতে হবে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রাগ-মিশ্রণের প্রচেষ্টা খুব পুরাতন নয়। সঙ্গীত-শিল্পীর চিন্তাবোধ এবং পরীক্ষা-মূলক গবেষণার ফলেই রাগ-মিশ্রণের সৃষ্টি হয়, তাই এই সব সৃষ্টিকে পুরাতনের বিপরীতধর্ম্মী বলা যায়। শাস্ত্রসম্মত গঠনের বাইরে এইসব পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা যদি সঙ্গীত সমাজ স্বীকার করে নিতে পেরেছে তবে রবীন্দ্রনাথ যে সব রাগমিশ্রণ

করেছেন তার স্বীকৃতি হবেনা কেন! আজকের দিনের বহু শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন রাগ-রাগিণীর মিশ্রণেই এই সব রাগ-রাগিণী সৃষ্টি হয়েছে। মেঘ ও মালকোষ রাগের মিশ্রণে যে রাগ সৃষ্টি হলো তাই আজকের দরবারী-কানাড়া। কানাড়ায়, মেঘ ও মল্লার রাগের মিশ্রণে যে গঠননৈপুণ্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের "কোথা যে উধাও হলো" গানটিতে, ভারতীয় সঙ্গীতে তার প্রয়োগ ইতিপূর্ব্বে আর হয়নি। এই যে নতুন রাগের সৃষ্টি হলো তাকে "রবি-মল্লার" বলা হয়—কিন্তু সঙ্গীত-সমাজে তার স্বীকৃতি কোথায়?

১৮৮১ থেকে ১৯১১।১৯১২—এই ত্রিশ বছরে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রায় এক হাজার গানের ব্যাপক আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি গান উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্। গৌরী এবং পূরবী রাগিণীর মিশ্রণে রচিত "ঘাটে বসে আঁছি", পরজ ও বসন্তের মিশ্রণে "গভীর রজনী নামিল", দেশ ও খাম্বাজের মিশ্রণে "তোমায় যতনে রাখিব", দেশ ও মল্লারের সমন্বয়ে "গরব মম হরেছ প্রভু", বাহার ও বাগেশ্রীর মিশ্রণে "আমার মিলন লাগি", আশা ও ভৈঁরোর সমন্বয়ে "তোমারি নামে নয়ন মেলিনু", মিশ্র ছায়ানটে "অন্ন লইয়া থাকি", ইত্যাদি গানগুলি সত্যই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্য্যায়ের। "আমি কি বলে করিব নিবেদন" (সিন্ধু বারোঁয়া), "চরণধ্বনি শুনি" (সিন্ধু কাফি), "গায়ে আমার পুলক লাগে"

(সিন্ধু-খাম্বাজ,), "আজি যত তারা" (লুম-খাম্বাজ), "আরো আঘাত সইবে আমার" (ঝিঁঝিট-খাম্বাজ), "মিটিল সব ক্ষুধা" (আশা-ভৈরবী), "নিবিড় অন্তরতর বসন্ত" (বাগেশ্রী-বাহার), "পুষ্প ফোটে কোন কুঞ্জবনে" (পিলু-বারোঁয়া), "ওগো শেফালি বনের" (টোড়ি-ভৈরবী), "দেখে যা দেখে যা" (কালাংড়া-সোহিনী), "হেলা ফেলা সারা বেলা" (বাহার-বারোয়াঁ), "সখি আমারি দুয়ারে" (হাম্বির-কেদারা), "আজি শরত তপনে" (যোগিয়া-বিভাস), "পুষ্প বনে পুষ্প নাহি" (ললিত-কালাংড়া), "প্রতিদিন তব গাথা" (জিলফ্‌-বারোয়াঁ), "ধনে জনে আছি" (সিন্ধুড়া-খাম্বাজ), ইত্যাদি গানে রাগ-মিশ্রণের ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রগত নিষ্ঠার প্রমাণ পাই।

১৯১১।১৯১২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত ত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় আমরা রাগমিশ্রণের একটা ভিন্নতর রূপ দেখতে পাই। "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি" গানটি বাহার ও সাহানার মিশ্রণে প্রস্তুত, আবার স্থানে স্থানে সামান্য বাগেশ্রীর ছোঁওয়া লেগেছে। সিন্ধু ও কাফির মিশ্রণে রচিত "দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া" গানটির 'আকাশে চাই তোমার লাগি' এই কয়টি কথায় বাগেশ্রীর প্রয়োগ বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। "বাদল মেঘে মাদল বাজে" গানটির স্থায়ী ও অন্তরা খাম্বাজ ও দেশমল্লারে রচিত, কিন্তু সঞ্চারি ও আভোগে সিন্ধু সুপরিস্ফুট। "আকাশ জুড়ে শুনিনু" ও "হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী" এই দুইটি গানে

খাম্বাজ ও বেহাগের যে মিশ্রণ হয়েছে তা অপূর্ব্ব। "মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের" গানটি রামকেলি ও ভৈরোঁর মিশ্রণে প্রস্তুত, সামান্য যোগীয়া এর মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু এই গানটির 'তুমি জাগাও তারে' এ কয়টি কথায় ওড়ব বিভাস এবং 'রাতের অন্ধকারে' এ কয়টি কথায় আশাবরীর যে প্রয়োগ পাওয়া যায় তা সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। আলাইয়া, কেদারা, ছায়ানট, বেহাগ, ছায়া ও হাম্বীর এই সবকয়টি রাগের মিশ্রণে রচিত হয়েছে "অরূপ তোমার বাণী" গানটি। "অকারণে অকালে মোর" গানটির মধ্যে পিলু বারোঁয়া, সাহানা ও মল্লারের সমন্বয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারং ও কানাড়ায় "মঞ্জরী ও মঞ্জরী" গানটির সুরে নূতনত্ব আছে। "যাবার বেলা শেষ কথাটি" গানটির মধ্যে মূলতান, ভীমপলশ্রী, ও পটদীপের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। রামকেলি, যোগীয়া, কালাংড়া ও ভৈরবীর মিশ্রণে রচিত "আলোর অমলকমলখানি" সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

ঠুংরী পদ্ধতির সঙ্গীত-রচনা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নেই। "মহারাজা কেবড়িয়া" এই হিন্দি ঠুংরীর সুরে "খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো" গানটি এবং 'কৈ কছু কহরে' এই হিন্দি ঠুংরীর সুরে রচিত "তুমি কিছু দিয়ে যাও" এই দুইটি রচনা ঠুংরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঋতু-সঙ্গীত

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-কাব্যে ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বিভিন্ন ঋতু সম্পর্কীয় রচনা একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে প্রকৃতির যে কতটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তা জানা যায় এই সব রচনার মধ্য দিয়ে। "মেঘ" "বসন্ত" ইত্যাদি কয়েকটি রাগের নামকরণ বিচার করলে বোঝা যায় যে সঙ্গীত-সাধকদের মধ্যেও প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, বিভিন্ন ঋতুতে স্বতন্ত্র রাগ-রাগিণী পরিবেশনের যে নির্দ্দেশ আছে সেদিক থেকে ভাবলেও এই একই কথা মনে আসে। পুরাতন আশ্রম জীবনে ঋতু-বন্দনা ও বিভিন্ন ঋতু নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল এ কথা জানা যায় বহু প্রাচীন পুঁথি থেকে। আধুনিক সভ্যতার চাপে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলাম, ঋতু উৎসব ইত্যাদি লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, যাদের পুনরুদ্ধার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শারদোৎসব ঋতুনাট্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। ……বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান

সৃজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান করে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটে না। ...হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল সার্থক হয়। ..... মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভার ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড়ো হয়ে উঠে। ......তাই নবঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরে চারিদিক হতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জেগে ওঠে তাহলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সেই বিচ্ছেদ দূর করবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি।"

বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, ঋতুরঙ্গ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ঋতু-উৎসবগুলি রচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হলো প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই মনের সূত্রটির পুনরাবিষ্কার করতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

"নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম

প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্প পর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য-শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না।”

এই কয়টি কথা থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মনে, মানব-জীবন ও প্রকৃতি সমভাবেই প্রভাবিত করেছিল—রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এর সত্যতাই প্রমাণ করে। যে মানব-জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে আলো, বাতাস, জল, ও পত্রপুষ্প ইত্যাদির উপর এবং প্রাচুর্য্যের সঙ্গেই যে স্নেহ-সম্ভার প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে, তাদের কৃতজ্ঞতা বোধেও আমরা স্মরণ করিনা, রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ আমরা পাই তাঁর বহু লেখার মধ্যে। কেবলমাত্র ঋতু-বন্দনা নয়, আকাশে, বাতাসে, পত্রপুষ্পে, ফলফসলে যে পরিবর্ত্তন আসে বিভিন্ন ঋতুর সমাগমে ও অবসানে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা আছে তাঁর সঙ্গীতে—ঋতুচক্রের নানা আবর্ত্তনে ধরিত্রীর

নিত্য নবরূপ সবই চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। প্রকৃতির যে সব আশীষ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী সেই দিনের সূর্য্য, চাঁদের আলো, জল মাটির মধ্যে যে বিশ্বপ্রকৃতি জাগ্রত, রবীন্দ্রনাথ তাদের সত্য করে আমাদের দেখিয়েছেন তার গানের মধ্য দিয়ে—তাই তিনি লিখেছেন—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি ॥"

"বনবানী" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমার ঘরের আশে পাশে যে সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে। হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে

তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমাশক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈ বানন্দস্য মাত্রানি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

এই যে আমাদের দেশের পরিবর্ত্তনশীল ছয়টি ঋতু এ আর কোন দেশে আছে। ঋতুচক্র প্রকৃতিরই একটি অঙ্গ বিশেষ তাই ঋতু-সঙ্গীত পর্য্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি নিয়ে যে অবতারণা করা হলো তা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। বস্তুতঃ দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক বন্দনা রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সম্বন্ধীয় রচনাতেই স্থান পেয়েছে বেশী। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি নিত্য নব রূপধারণ করে বিভিন্ন ঋতুর আগমনে ও অবসানে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলির এই আঙ্গিক পরিবর্ত্তনই বিভিন্ন ঋতুর বার্ত্তাবহরূপে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদের অস্তিত্বকে, আপন আপন নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সঙ্গে ষড়্ ঋতুর এই যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এর প্রমাণ পাওয়া যায় একটি কবিতায় যেটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ১৩১৫ সালে শারদোৎসবের নান্দী কবিতা হিসেবে—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি' যায়

সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভ'রে দিল সবাকার মন ॥
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জে যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি,
স্বর্ণ দীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধহাস্যে সেই রসময়
নির্ম্মল শারদরূপে কেড়ে নিল সবার হৃদয় ॥

প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্য এক রচনায় বলেছেন—

"প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না—আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূর বিস্তৃত শ্যামল নীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে।.........আমাদের দেশের সঙ্গীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভাল লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হয়েছে। সে রাগিণীর সবগুলো সকলের কাছে ঠিক লাগবে কিনা জানি না। অন্ততঃ আমি সারং রাগকে মধ্যাহ্ন কালের সুর বলে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিনা। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের

গুণীদের অন্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করেছে। বাইরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি, কানাড়া তাই জানাচ্ছে।"

এ পর্য্যন্ত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কাব্যাংশকে ঘিরেই, এখন সুরসংযোজনার দিক থেকে আলোচনা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সঙ্গীত স্বভাবতঃই কাব্যধর্ম্মী, এই কারণে দেখা যায় যে তাঁর ঋতু-সম্বন্ধীয় সঙ্গীত-রচনার অধিকাংশই শেষের দিককার রচনা—পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচনা সুরধর্ম্মী আর কাব্যধর্ম্মী রচনা অধিকাংশই রচিত হয়েছে শেষের দিকে। ঋতু-সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা, সংখ্যায় যেমন এর প্রাচুর্য্য, বৈচিত্রের দিক থেকেও এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। বর্ষাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সব থেকে প্রিয় ঋতু তাই ঋতু সঙ্গীতের মধ্যে বর্ষার গানই সংখ্যায় অধিক। বর্ষার পরেই বোধ হয় বসন্তের স্থান, তার পরেই শরৎ। হেমন্ত ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা সর্ব্বাপেক্ষা কম। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে বর্ষার কবি বলে থাকেন। বর্ষার রূপ রবীন্দ্র-নাথের মনকে এতো নিবিড় ভাবেই আচ্ছন্ন করেছিল যে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার সঙ্গীত-রচনা কাব্য ও সঙ্গীত উভয় দিক থেকেই একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বর্ষার গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লার জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।…বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে—তার পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব।…এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দে, বজ্রের গর্জনে, আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠেছে, খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে।… আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠছে।… মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর বৃষ্টির অনুকরণ, না থাকে ঘড়ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব বিলাসী তাকে অবাস্তব বলে নিন্দা করে না।… …মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা। যতবার পদ্মার উপরে বর্ষা হয় তত বারই মনে করি মেঘমল্লারে নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে

একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য নূতন অনাদি-অনন্ত বিরহ-বেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।"

বসন্ত ঋতু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন, তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরা ফুল; আবার যখন পাল্টে নেন, তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী;— তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী; চৈত্রের কণক-চাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সঙ্গীত বিভিন্ন পদ্ধতির সুরে সমৃদ্ধ। উচ্চাঙ্গ পদ্ধতির খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদির সুরে রচিত গান পাওয়া যায় ঋতু-সঙ্গীতে আবার মিশ্ররাগের লঘু-ছন্দের গানেরও অভাব নেই। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আদর্শে রচিত গান স্বভাবতঃই সুরধর্ম্মী হয়ে পড়ে, কিন্তু ঋতু-সঙ্গীতের কাব্যাংশই প্রধান, তাই লক্ষ্য করা যায় যে মিশ্ররাগের রচনাই ঋতু-সঙ্গীতের মধ্যে সংখ্যায় অধিক। এর পরে উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন ঋতুর কয়েকটি গানের উল্লেখ করে এ অধ্যায় শেষ করব—

গ্রীষ্ম— ১। নাই রস নাই

২। প্রখর তপন তাপে
৩। বৈশাখ হে মৌনী তাপস
৪। এসো হে বৈশাখ

বর্ষা— ১। আজ শ্রাবণের গগনের গায়
২। মেঘছায়ে সজল বায়ে
৩। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
৪। থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ

শরৎ— ১। এসো শরতের অমল মহিমা
২। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
৩। এই শরৎ আলোর কমল বনে
৪। শরৎ তোমার অরুণ আলোর

হেমন্ত—১। হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী
২। হায় হেমন্ত লক্ষ্মী
৩। সেদিন আমায় বলেছিলে

শীত— ১। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
২। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
৩। এলো যে শীতের বেলা
৪। ছাড়গো তোরা, ছাড়গো,

বসন্ত— ১। এসো এসো বসন্ত ধরাতলে
২। আমার বনে বনে ধরল মুকুল
৩। বসন্তে কি শুধু কেবল
৪। বসন্তে সে যায় তো হেসে

শিশু-সঙ্গীত

সাহিত্যক্ষেত্রে যেমনি, তেমনি সঙ্গীতক্ষেত্রেও আমাদের শিশুরা ছিল চির-উপেক্ষিত। শিশু-সাহিত্য বলতে সেদিন ছিল ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুরমার কাছে শোনা রূপকথার গল্প আর শিশু-সঙ্গীত বলতে তখন ছিল ছেলে-ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া ইত্যাদি সুর করে পড়া। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই বহু পুরাতন অভাব দূর করলেন সাহিত্যে, সঙ্গীতে শিশুদের জন্য নানা রচনাসম্ভারে। সাহিত্যক্ষেত্রে সৃষ্ট হল 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' ইত্যাদি যুগান্তকারী রচনা আর সঙ্গীতে এল শিশুদের উপযোগী নানা গান, নাটক ইত্যাদি। শিশুচিত্তের তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, দেশবিদেশের আর কোনো কবি এতটা সাফল্যের সঙ্গে তা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ শিশু-চরিত্রকে অন্তর থেকে ভালোবেসে-ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে শিশুর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছিলেন। বিভিন্ন ঋতুর জন্য তিনি যে কয়টি নাটক রচনা করেছেন তার মধ্যে অতি পরিচিত "ঠাকুর্দ্দা" চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়— যে চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন।

সঙ্গীতে কি সাহিত্যে শিশুদের জন্য রচনার গুণাগুণ ও সার্থকতা নির্ভর করে তাদের শিশুমনের স্বীকৃতির উপরে। ছোটদের ভালো লাগানো সহজসাধ্য নয় তাই শিশু-সঙ্গীতের কাব্যাংশে ও সুরে এমন সব উপাদান থাকবে যা সহজেই শিশু-চিত্তকে জয় করতে পারে। শিশু-চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে যেসব বস্তুকে তারা চেনে, জানে তাদেরই তারা ভালবাসে, নতুনকে জানার আগ্রহ তাদের অবশ্যই আছে কিন্তু সেটা কৌতূহলবশেই। রবীন্দ্রনাথের শিশু-সঙ্গীতে তাই আমরা দেখি ফুলের গান, আলোর গান, বাতাসের গান, ঝড়ের গান ইত্যাদি যে সব গানের ভাবার্থ বুঝতে শিশুদের ভাবিত করে তোলে না। সুরের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের শিশু-সঙ্গীত হয়েছে সোজা সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে, মনের আনন্দে, নেচে যেসব গান শিশুরা গাইতে ভালবাসে।

শিশু-সঙ্গীত পর্য্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এ রকম সঙ্গীত-রচনার সংখ্যা একশোরই বেশী। "আমাদের পাকবেনা চুল গো", "আমাদের ভয় কাহারে", "হেদে গো নন্দরাণী", "ওরে বকুল পারুল", "আমরা খুঁজি খেলার সাথী", "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে", "দূরদেশী ঐ রাখাল ছেলে", "নূপুর বেজে যায়", "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে", "শরৎ তোমার অরুণ আলোর", "শিউলি ফুল, শিউলি ফুল", "ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু", "আমি পথভোলা এক

পথিক এসেছি” ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্য রচিত গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য হিসাবে “কাল-মৃগয়া” বিশেষভাবে শিশুদের জন্যই রচনা করেছেন।

কাব্য-সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথকে গীত-রচয়িতা এবং কবি হিসাবে যদি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিবিধ রচনা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যাংশর মধ্য দিয়ে আমরা তার কবিমনের আভাষ পাই আবার তার কবিতা রচনার মধ্যে আমরা সঙ্গীতের অনুভূতি বোধ করি। কবিমন নিয়ে তিনি চোখে যা দেখছেন তা ভাষায় প্রকাশ করেছেন আর গীতিকার হয়ে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে তাতে রংএর তুলি বুলিয়েছেন—তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত যখন কথা, সুর, ছন্দ ও ভাবের আদানপ্রদানে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তখন চোখের সামনে গানের বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর মনের মধ্যে আমরা তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ অনুভব করতে থাকি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কাব্য ও সঙ্গীত এমন পারস্পরিক সঙ্গতিবোধ নিয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই এই পরস্পরের সংযোগসাধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনো গীতিকার হয়তো গানের কথার অংশ রচনা করলেন আর তার সুর সংযোজনা করলেন অন্য কোনো সুরকার—দুইটি বিপরীতপন্থী চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হয়তো ঘটলো কিন্তু সম্পূর্ণতা এল না, গীতিকারের সৃষ্টির ভাবার্থ সুরকারের সুর

যোজনার আদর্শে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এরকম প্রমাণের অভাব হয় না।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান অংশটাই, যেমন খেয়াল, ঠুংরী, ধ্রুপদ, টপ্পা ইত্যাদি হলো সুরধর্ম্মী, সেখানে কাব্যাংশের কোনো মর্য্যাদাই নেই। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের একেবারের প্রথম দিককার কিছু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচনা ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৃহদাংশই কাব্যধর্ম্মী, গানের কথার অংশ সেখানে রাগ-রাগিণীর কাছে মাথা হেঁট করেনি যেমনটি দেখা যায় আমাদের কীর্ত্তন, বাউল ইত্যাদি লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—

"বাংলা দেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্ব্বদা প্রাণবান করে রাখ্‌তে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্ত্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে; প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। ...কিন্তু অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি; নিজের টিকি পর্য্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘরজামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার

স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না।……আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি—কিন্তু বাঙালীর ঘরে সেতো আতিথ্য দিতে আসবে না—সে নিজেকে দেবে, নইলে উভয়ের মিলন হবে না।……হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদী করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিল্‌চে না দেখে পণ্ডিতেরা যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটছে তখন তাঁরা পণ্ডিতি স্পর্দ্ধা করেন, সেই স্পর্দ্ধা সব চেয়ে দারুণ। ……সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন্ বিচ্ছিন্ন করেছে বলেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কার্য্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাংলা গানেও কি তার সূচনা হয়নি, এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না?”

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিরিশ বছরের রচনা সৃষ্ট হয়েছিল একেবারে সাঙ্গীতিক মনোভাব নিয়েই—যার অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীত পর্য্যায়ের, ধ্রুপদ, টপ্পা, ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে এবং নানাবিধ কূটতালের ব্যবহারে যাদের পুরোদস্তুর শাস্ত্রীয় বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনায় বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকের গানে কিন্তু বিপরীত

ধর্ম্মী একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল যখন তাঁর কাব্যপ্রতিভা সাঙ্গীতিক বিধিনিষেধের মধ্যে আর আবদ্ধ হতে চায়নি। গানের বাণীর স্থান হল তখন সর্ব্বাগ্রে, সুর ও ছন্দ এখানে বাণীর বিকাশেই আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও সঙ্গীত-প্রতিভা আপন আপন যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিল তার ব্যতিক্রম ঘটলো তার শেষের দিকের গানে, যার মধ্যে তাঁর দুইটি প্রতিভার মিলন সাধিত হয়েছে। আজকাল গানের বাণী নিয়ে নানারকম সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়, এ থেকেই বোঝা যায় যে গানের বাণী সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে আর পূর্ব্বের মতো উপেক্ষার বস্তু নয়—এই পরিবর্ত্তন এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই, আমাদের উন্নততর রুচিবোধের জন্য। অন্যান্য প্রদেশের কথা জানি না, তবে বাংলা দেশের সঙ্গীতে যে নূতন মার্জিত রুচিবোধ এসেছে, তার জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য, এ কথা এখন আর অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলন সাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে,—আর অনিন্দনীয় কাব্য-মহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে। একদিন বাংলার সঙ্গীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে

১২

পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সঙ্গীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার কালের গ্রামোফোন সঞ্চারী গীতপতঙ্গের দুর্ব্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্ত্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্য কালের মহাপ্রাঙ্গনে।"

কাব্য-সঙ্গীতই হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যান্য পর্য্যায়ের রচনা ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কাব্য-সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রতিভার নিজস্ব সৃষ্টি এবং বাংলা গানে এই পর্য্যায়ের রচনায় রবীন্দ্রনাথই পথ-প্রদর্শক। কাব্য সঙ্গীত হলো রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এমন একটি ধারা যা অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় মিশ্র রাগের ব্যবহারে ও সহজ তালের প্রয়োগে কাব্য-সঙ্গীত হয়েছে এমন একটি ধারা যার দখল পেতে পুঁথিগত জ্ঞানসঞ্চয়নের বিশেষ প্রয়োজন হয় না,—কাজেই বলা যায় যে বাংলা দেশের সঙ্গীতানুরাগী জনসাধারণের জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই স্মরণীয় সৃষ্টি। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণযোগ্য—কেননা সহজ সুর ও তালের মিশ্রণেই এই সঙ্গীত সৃষ্ট, যদিও উন্নততর রুচিবোধ ও শিল্পবোধ এই পর্য্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশনে প্রয়োজনীয়। এই সব গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যারা খেটে খায় তাদের পক্ষে কালোয়াতি গান হয়ে ওঠে না, তাদের পক্ষে ওস্তাদের মত গলা সাধা শক্ত—সেই জন্য আমার গান ব্যবসায়িদের বাইরে থাকাই ভালো। গান হবে যারা আশে পাশে থাকে যাতে তারা খুশী হয়···বাইরের হাততালি পাবার জন্য নয়। ওস্তাদ যারা তাদের জন্য ভাবনা নেই, ভাবনা হচ্ছে যারা গানকে সাধাসিধেরূপে মনে আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের জন্য। আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত গলা ছেড়ে গাবে······আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্য্যন্ত এর খুব বেশী উচ্চাশা মনে নাই রাখলাম।"

"সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমাদের দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত ও অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কতকগুলা সুর-সমষ্টির কর্দ্দম এবং রাগ-রাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।'

রবীন্দ্রনাথ করলেন এই মাটির প্রতিমার মধ্যে প্রাণস্পন্দন কাব্য-সঙ্গীত সৃষ্টি করে, যেখানে রাগ-রাগিণী ও কাব্যরসের হলো গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম—যে সঙ্গীতে ওস্তাদীর চেয়ে অনুভূতি হলো আদর্শ। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ ধরা পড়লো, মানবাত্মা ও প্রকৃতির আদর্শ

প্রচারিত হলো এই সঙ্গীতে, জীবনের প্রতিটি ছবি অঙ্কিত হলো কাব্যমহিমামণ্ডিত করে—সঙ্গীতের হলো মহামুক্তি। রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় লিখেছেন—

"চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্ম্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কি নূতন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি—এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা, এইটেই সমস্ত নয়।······বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানতঃ বস্তু ও আলোকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্য্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি, আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারিব না—কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতি বিচিত্র সঙ্গীত রূপেই প্রকাশ পাইত—তবে অক্ষররূপে নহে বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার আয়তনহীন বাণীর ভাবে

আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কতরকম ভাবে যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।"

রবীন্দ্রনাথের এই সব লেখা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণ হয় কেন সঙ্গীত ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ অবস্থায় অর্থাৎ প্রথম জীবনের সঙ্গীত-রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তুষ্ট হতে পারেন নি। নিছক সঙ্গীত হিসাবে যে সৃষ্টি হয়েছিল সেদিনে তা ছিল হাতেখড়ির অ, আ, ক, খ, যার প্রয়োজন হলো সেই চিরপুরাতনকে জানবার চেষ্টা, কিন্তু শিক্ষা জীবনে জ্ঞান-সঞ্চয়নের যে পরিণতি তাই প্রতিভাত হলো কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যে, যার রূপ হলো ধীর, স্থির—যে সঙ্গীত সৃষ্ট হলো আপন রূপকে ব্যক্ত করবার জন্য, যে সঙ্গীতের রূপকে না স্বীকার করলে সঙ্গীতই অস্বীকৃত হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য, তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন।……গান রচনায় আমি কি করেছি, কোন পথে গেছি গানের তত্ত্ব-বিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো বড়ো বাগানওয়ালাদের কীর্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না………আমাদের

সঙ্গীত জিনিষটাই ভূমার সুর, তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নয়, কেননা বিকৃতিকে নিয়েই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তা বৃহত্তের বিরুদ্ধ। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী কিন্তু অট্টহাস্য নয়। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি।… শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তখন সে নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা।”

কাব্য-সঙ্গীতে আর একটি জিনিষ আমরা পেয়েছি তা হলো বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ছন্দ নিয়ে এই পুস্তকের ভূমিকায় বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তাই তার পুনরুক্তি আর এখানে করা হলো না, তবে এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলা যেতে পারে যে বিবিধ ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব পরীক্ষা করেছিলেন তা এই কাব্য-সঙ্গীতকে ঘিরেই। এ সম্পর্কে একটা মস্ত সুবিধা হলো, এই যে কাব্য-সঙ্গীত পর্য্যায়ের রচনায় অন্যান্য ধারার গানের জন্য নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রগত বিধিনিষেধ নেই। আর একটা পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ সাফল্যের

সঙ্গে করেছেন এই কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যে তা হলো কবিতার ছন্দ নিয়ে গানের মধ্যে তার প্রয়োগের চেষ্টা, ছন্দ নিয়ে এইটেই হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"অনেক দিন থেকেই কবিতা লিখছি, এই জন্য, যতই বিনয় করিনা কেন, এটুকু না বলে পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ নিয়ে যখন গান লিখতে বসলাম, তখন চাঁদসদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের ওস্তাদী দেবতা তেমনি ফোঁস করে উঠলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করেনা, তাতে বৈচিত্র্যকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। সেই কথা মনে রেখে বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করতে সঙ্কোচ বোধ করিনি। কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলবে এই ভরসা করে গান বাঁধিতে চাইলেম।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যে আর একটি সার্থক সৃষ্টি হলো গদ্য-গান। বাংলা কবিতায় ও বাংলা সঙ্গীতের কাব্যাংশে মিল রক্ষা করা এই ছিল চিরাচরিত রীতি, আধুনিক সাহিত্যে যেমন এলো মিলহীন গদ্য-কবিতা, রবীন্দ্র-

নাথও সৃষ্টি করলেন অমিল কাব্যাংশ নিয়ে গদ্য-গান। এই সব গদ্য গানের কোনো কোনোটিতে ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে আবার কয়েকটিতে তালের প্রয়োগ করা হয়নি।

সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সঙ্গীতে শুদ্ধ রাগ, কূট তাল, ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন প্রণালী, এই সব একেবারেই বর্জ্জন করেছেন। সহজ সুরে ও সহজ তালে এই কাব্য-সঙ্গীত রচিত হয়েছে এই আদর্শে যাতে সুরবিন্যাস ও ছন্দ প্রাচুর্য্যে গানের ভাবার্থকে নষ্ট না করতে পারে। রাগমিশ্রণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার অধিকাংশ পরীক্ষা করা হয়েছিল এই কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যেই। লোক-সঙ্গীতের সুর যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায় কাব্য-সঙ্গীতে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্র রাগ ও লোক-সঙ্গীতের সুরের সংমিশ্রণ পাওয়া যায় এই পর্য্যায়ের গানে। এর পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীত পর্য্যায়ের কয়েকটি রচনার উল্লেখ করে এ অধ্যায় শেষ করব। "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে," "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি", "তুমি কি কেবলি ছবি", "কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া", "নহ মাতা, নহ কন্যা", "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে", "ওগো কিশোর আজি", "হে নিরুপমা", "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে", "নৃত্যের তালে তালে", "আজি যে রজনী যায়", "ওগো শেফালি বনের মনের কামনা" ইত্যাদি গানগুলি কাব্য-সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য রচনা। কাব্য-সঙ্গীতে

আর একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হলো এই যে, এই পর্য্যায়ের অধিকাংশ গানের কাব্যাংশ রচিত হয়েছিল পূর্ব্বে অথচ সে সব রচনায় সুর দেওয়া হয়েছে অনেক পরে এমনকি কুড়ি, একুশ বছরের ব্যবধানে।

প্রেম-সঙ্গীত

প্রেম-সঙ্গীত, ধর্ম্মসঙ্গীতের মতই এমন একটি ধারা যার রচনাকাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির একেবারে আদি যুগ থেকে শেষকাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাই এর মধ্যেও আমরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান তিনটি যুগের প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি। সংখ্যানুপাতে এই ধারার স্থান দ্বিতীয়, ধর্ম্মসঙ্গীতের পরেই। "গীতবিতানে" রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে ৩৯৫টি গান প্রেম-সঙ্গীত পর্য্যায়ভুক্ত বলে বর্ণিত আছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাট্য রচনা "মায়ার-খেলার" গল্পাংশ প্রেমবিষয়ক এবং সর্ব্বশেষ নাট্যরচনা "শ্যামা" নৃত্যনাট্যের গল্পাংশও ঐ বিষয়ের।

প্রেম-সঙ্গীত স্বভাবতই একটি কাব্যধর্ম্মী ধারা এবং এর নামের মধ্যেই এর কাব্যাংশের আদর্শ পরিস্ফুট। সুরযোজনার দিক থেকে বহু বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই পর্য্যায়ের গানে। একেবারে প্রথম দিকের কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলো, যার মধ্যে প্রাচীন ঢঙএর পরিবেশন প্রণালীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়—

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মরি লো মরি আমায়,
দুজনে দেখা হলো,
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে,

তবু মনে রেখ,
সখি, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, ইত্যাদি।

উপরোক্ত গানগুলি ১৮৯০ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় কালের রচনা। এর পরে যে প্রেম-সঙ্গীতগুলি পাওয়া যায়, তার সুর যোজনায় অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য, পরিবেশনকালে ঠিক প্রাচীন ঢঙএর প্রকাশ না পেলেও এগুলি প্রাচীনপন্থী। কাব্যাংশের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা এই সব গানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যার কয়েকটির উল্লেখ করা হলো—

কেন বাজাও কাঁকণ,
আমি কেবলি স্বপন,
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,
হেরিয়া শ্যামল ঘন, ইত্যাদি।

১৯০০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সঙ্গীত রচনার আঙ্গিক সুর-যোজনার ভিন্নরূপ বিস্ময়কর। কাব্যাংশের যে সংস্কার অন্যান্য ধারার রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, প্রেম-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে এই পর্য্যায়ের গানে রাগসম্মত রচনাও আছে, লোক-সঙ্গীতের সুরের রচনাও পাওয়া যায়, মিশ্র রাগের গানের সংখ্যাত অসংখ্য। এর পরে বিভিন্ন সুরের প্রেম-সঙ্গীতের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হলো—

রাগসম্মত রচনা

১। চিত্ত পিপাসিত রে,
২। পাখী আমার নীড়ের পাখী,

৩। তুমি রবে নীরবে,
৪। চোখের আলোয় দেখেছিলেম,
৫। আমার প্রাণের পরে চলে গেল,
৬। সে ছিল আমার স্বপনচারিণী,
৭। বাণী মোর নাহি,
৮। ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী,
৯। বিরহ মধুর হলো আজি,
১০। সখি, আঁধারে একেলা ঘরে,
১১। গহন ঘন বনে,
১২। কে উঠে ডাকি,

মিশ্ররাগের রচনা

১। হে নিরুপমা, হে নিরুপমা,
২। আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা,
৩। একলা বসো হেরো তোমার ছবি,
৪। অলকে কুসুম না দিও,
৫। সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে,
৬। স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে,
৭। ওগো কিশোর আজি,
৮। তার হাতে ছিল,
৯। একদা তুমি প্রিয়ে,
১০। ঘরেতে ভ্রমর এলো,

লোকসঙ্গীতের সুরের রচনা

১। সখি তোরা দেখে যা,
২। আজি এ নিরালা কুঞ্জে,

৩। হৃদয়ের একুল ওকুল,

৪। আমার প্রাণের মাঝে,

৫। সে আমার গোপন কথা,

৬। বিনা সাজে সাজি,

৭। আনমনা, আনমনা,

৮। না না, ডাকব না,

নূতন তালের রচনা

১। নিদ্রাহারা রাতের এ গান,

২। নিলাঞ্জন ছায়া,

৩। ব্যাকুল বকুলের ফুলে,

৪। কাঁপিছে দেহলতা থরথর,

ঋতু-কালীন রচনা

১। বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া, (গ্রীষ্ম)

২। মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে, "

৩। বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে, (বর্ষা)

৪। মেঘছায়ে সজল বায়ে, "

৫। এই শরৎ আলোর কমলবনে, (শরৎ)

৬। সখি, আমারি তুয়ারে কেন, "

৭। হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী, (হেমন্ত)

৮। সেদিন আমায় বলেছিলে, "

৯। শিউলি ফোটা ফুরোল যেই, (শীত)

১০। চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে, (বসন্ত)

১১। আজি দক্ষিণ পবনে, "

ধর্ম্মসঙ্গীত

এই পুস্তকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার তিনটি স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অধিকাংশ ধারা সম্পর্কেই লক্ষ্য করা যায় যে তাদের অস্তিত্ব এই তিনটি স্তরের একটি বা দুইটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু ধর্ম্মসঙ্গীতের রচনার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। ধর্ম্মসঙ্গীতের রচনাকাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির সমগ্র ৬১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা," "তোমারই তরে মা সঁপিনু দেহ" ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা থেকে শেষ রচনা "হে নূতন দেখা দিক আরবার" পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রায় এক হাজার ধর্ম্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। যুগ ও রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গঠন-বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে,—কিন্তু সে আঙ্গিক পরিবর্ত্তন কাব্যাংশ ও সুর-বিন্যাসের আদর্শেই হয়েছিল এবং অন্যান্য কয়েকটি ধারার মতো ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা কয়েকটি যুগ বা স্তরের অন্তবর্ত্তী ক্ষণস্থায়ী রচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুর ও সংযোজনার ক্ষেত্রেও বহুবিধ পরীক্ষা এই ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যেই হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক আবহাওয়াই ছিল তাঁর সঙ্গীত রচনার প্রধানতম প্রেরণা ও উৎসস্থল আর সেই আবহাওয়ার মধ্যে ধর্ম্মসঙ্গীতের প্রচলনই ছিল সমধিক। আমরা রবীন্দ্রনাথের আদি যুগের রচনার মধ্যে ধর্ম্মসঙ্গীতই বেশী করে পেয়েছি, তাই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্ব্বে সে সময়কার ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার কথা কিছু বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—

> "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম—এ খেলার অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গই একেবারে অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদির উৎসাহ ও প্রেরণা ফলেই রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় চেষ্টিত হয়েছিলেন। "জীবন-স্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত, পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন—তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত।—চাঁদ উঠিয়াছে গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি।"

১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব রচনা "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" মহর্ষিকে শোনালেন—গান গাওয়া শেষ হলে দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে একটি পাঁচশত টাকার চেক্ হাতে দিয়ে বল্লেন—"দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত তারা পুরস্কার দিত রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" সঙ্গীত রচনায় এই ভাবেই উৎসাহ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার বাল্যজীবনে ও যৌবনে পিতা ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে। আত্মীয়জন ছাড়াও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী ইত্যাদির কাছে থেকে যে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলেন বাল্যজীবনে ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসৃষ্টির ইতিহাসে তার দামও কম নয়।

বাল্যজীবনে পারিবারিক আচার, উৎসবে এবং ১৯০০—১৯০১ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক জীবনে প্রয়োজনীয় নানা অনুষ্ঠানের জন্য রচিত ধর্ম্মসঙ্গীত আমরা পাই প্রথম দিকের রচনার মধ্যে। প্রতি বছরই মাঘোৎসবের জন্য নূতন গান রচিত হতো—আর লেখা হতো নানা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি। ১৯১০।১১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত আমরা পেলাম রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি যা গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির

অন্তর্ভুক্ত। এই সব গান অধিকতর কাব্য মণ্ডিত হলো এবং এই সব গান থেকে সুরু করেই পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত রচনার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন এনেছিলেন।

সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতে বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ একেবারে গোড়া থেকে ১৯০৯।১০ সাল পর্য্যন্ত রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতগুলিতে বিশেষ ভাবে হিন্দুস্থানী গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এর কারণ হলো রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে ও যৌবনকালে বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী প্রমুখ সঙ্গীত শিক্ষকদের প্রভাব। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের ধর্ম্মসঙ্গীত রচনার সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১০।১১ সাল থেকে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত এবং স্বতন্ত্র রচনার অন্তর্গত ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব-মুক্ত এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এই সময় থেকে শেষ পর্য্যন্ত, কেবলমাত্র ১৯৩৭ সালের দক্ষিণী গানের সুরে রচিত কয়েকটি গানের সুর ছাড়া, এবং ১৯১৩ ও ১৯২৫ সালের কয়েকটি হিন্দিভাঙ্গা রচনা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় হিন্দুস্থানী বা অন্যান্য প্রাদেশিক সঙ্গীতের প্রভাব পাওয়া যায় না। হিন্দিভাঙ্গা ধর্ম্মসঙ্গীতগুলির অধিকাংশই ধ্রুবপদ্ধতির যদিও খেয়াল ও ভজনের সুরের

গানও যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া যায়। ভজনের সুরের যে সব রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই অন্যান্য প্রাদেশিক ভজনের সুর নিয়ে রচিত। ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপক্ড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক এই যে ছয়টি নূতন তাল রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন, সেই ছয়টি তালের অধিকাংশ রচনাই ধর্ম্মসঙ্গীত পর্য্যায়ের। এর পরে বিভিন্ন পর্য্যায়ের যেসব ধর্ম্মসঙ্গীত পাওয়া যায় তার অল্পসংখ্যক গান নিয়ে একটি তালিকা দেওয়া হলো—

হিন্দি ভাঙ্গা (ধ্রুপদ ও ধামার)

১। আজি বহিছে বসন্ত পবন (আজু বহত সুগন্ধ পবন—বাহার) তেওড়া

২। প্রথম আদি তব শক্তি (প্রথম আদি শিব শক্তি—দীপক পঞ্চম) —সুরফাঁকতাল

৩। আজি মম মন চাহে (ফুলি বন ঘন মোর—বাহার) চৌতাল

৪। আমারে করো জীবন দান (ইয়া জগ ঝুট—শঙ্করা) চৌতাল

৫। এ ভারতে রাখ (এ বতিয়াঁ মেরো—সুরট) চৌতাল

৬। শুভ্র আসনে বিরাজো (রুদ্রদেব ত্রিনয়ন—ভৈঁরো) আড়া চৌতাল

৭। সুধা-সাগরতীরে (আয়ো ফগুন বড়ো মান—নায়কী কানাড়া) ধামার

৮। জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে (আজু রঙ্গ খেলত হোরি—বেহাগ) ধামার

হিন্দি-ভাঙা (খেয়াল)

১। আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে (লাগি মোরে ঠুমক—মালকোষ) ত্রিতাল

২। চরণধ্বনি শুনি (মুরলী ধ্বনি শুনি—সিন্ধু) ঝাঁপতাল

৩। ডাকে বার বার ডাকে (মোহে কৈসে নিকি লাগি—কেদারা) ত্রিতাল

৪। নয়ান ভাসিল জলে (পাপিহা বোলেরে—শ্যাম) একতাল

৫। হৃদয় নন্দন বনে (উড়ত বন্দন নব—বসন্তপঞ্চম) ঝাঁপতাল

হিন্দি-ভাঙা (টপ্পা, ভজন, তেলেনা)

১। এ পরবাসে রবে কে হায় (ও মিঞা বেজনুওয়ালে—সিন্ধু) মধ্যমান

২। কে বসিলে আজি (বে পরিয়া তাঁড়ে—সিন্ধু) মধ্যমান

৩। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো (মিয়া বে মানুলে—ঝিঁঝিঁট) মধ্যমান

৪। মন জাগো মঙ্গল লোকে (জাগো মোহন প্যারে—ভৈঁরো) ত্রিতাল

৫। সুখহীন নিশিদিন (দারাদ্রিম দারাদ্রিম—নটমল্লার) ত্রিতাল

প্রাদেশিক ভজনের সুরের ধর্ম্মসঙ্গীত

১। বিশ্ববীণারবে (নাদবিদ্যা পরব্রহ্ম রস—শঙ্করাভরণ) মহীশূরীভজন, তালফেরতা

২। বাজে বাজে রম্যবীণা (বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা—ইমন কল্যাণ) পাঞ্জাবীভজন, তেওড়া

৩। আজি শুভদিনে পিতার ভবনে (পূর্ণ চন্দ্রাননে চিন্ময় হরণে) কর্ণাটীভজন

৪। এ হরি সুন্দর (এ হরি সুন্দর) পাঞ্জাবীভজন

৫। বাসন্তী, হে ভুবনমনোমোহিনী (মীনাক্ষী মে মুদম—পূর্ব্বকল্যাণী)
দক্ষিণীভজন, আদিতাল

৬। যদি আসে তবে কেন—পূর্ণষড়জ্ মহীশূরী—একতাল

নূতন তালের ধর্ম্মসঙ্গীত

১। বিপদে মোরে রক্ষা কর (ইমন কল্যাণ)—ঝম্পক
২। আমারে যদি জাগালে আজি (নট মল্লার)—ঝম্পক
৩। জ্বলেনি আলো অন্ধকারে (মিশ্র)—ষষ্ঠী
৪। আমার ভুবন ত আজ (মিশ্র)—ষষ্ঠী
৫। ঐরে তরী দিল খুলে (ভৈরবী)—রূপকড়া
৬। কত অজানারে জানাইলে তুমি (হাম্বীর)—রূপকড়া
৭। নিবিড় ঘন আঁধারে (সাহানা)—নবতাল
৮। প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে (টোড়ি)—নবতাল
৯। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া (সুরট মল্লার)—একাদশী
১০। জননী তোমার করুণ চরণখানি (গুণকেলি)—নবপঞ্চক

লোকসঙ্গীতের সুরের ধর্ম্মসঙ্গীত

১। ওহে জীবনবল্লভ (কীর্ত্তন)
২। প্রভু আজি তোমার (কীর্ত্তন)
৩। আমরা মিলেছি আজ (রামপ্রসাদী)
৪। তার অন্ত নাইগো (বাউল)
৫। যেথায় তোমার লুট হতেছে (বাউল)
৬। তোমার খোলা হাওয়া (ভাটিয়ালী)

অন্যান্য

১। জীবন যখন শুকায়ে যায়
২। তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
৩। একি করুণা করুণাময়
৪। এই তো তোমার আলোক ধেনু
৫। এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
৬। তোমারি নাম বলব নানা ছলে
৭। অন্ধকারের উৎস হতে
৮। জীবনে যত পূজা হলনা সারা
৯। আমার মাথা নত করে দাও
১০। তোমার সোনার থালায় সাজাব
১১। সীমার মাঝে অসীম তুমি
১২। ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
১৩। যতবার আলো জ্বালাতে চাই
১৪। আমার মিলন লাগি তুমি
১৫। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
১৬। আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায়
১৭। আমারে তুমি অশেষ করেছো
১৮। আমার সকল দুঃখের প্রদীপ
১৯। যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে

উদ্দীপনার গান

"উদ্দীপনার গান" এই ধারার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সংখ্যা অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনায় এদের একটা বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বীর্য্য, যৌবন ও পৌরুষের উপাসক একথা তাঁর বিবিধ রচনার মধ্য দিয়ে জানা যায়। রবীন্দ্র-কাব্যে ও সঙ্গীতের কাব্যাংশে এই ধরণের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতের সুর সংযোজনার ক্ষেত্রেও বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করেছেন, যার স্বাতন্ত্র্য অন্যান্য ধারার রচনার মধ্যেও সুপরিস্ফুট।

অনেকেরই ধারণা ছিল যে ভারতীয় সঙ্গীতে উদ্দীপনার গানের খুবই অভাব আবার অনেকে কেবলমাত্র স্বদেশী সঙ্গীতকেই এই পর্য্যায়ভুক্ত করে থাকেন। এই দুই ধারণাই যে ভুল একথা প্রমাণ যোগ্য। অনেকের মতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরে রচিত গানেই এই উদ্দীপনা সৃষ্টি সম্ভব, কিন্তু এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না কেননা আমরা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে ধ্রুপদ, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদির সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই পর্য্যায়ের বহু গান রচনা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের সুর নিয়ে উদ্দীপনার গান রচনা যে রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন

তা নয়, এ প্রচেষ্টা বহু পূর্ব্বেই হয়েছে। এ দেশে বহু পূর্ব্বে যে নওহরবাণী ধ্রুপদের গান পরিবেশিত হতো, শক্তির প্রকাশই ছিল যে সঙ্গীতের ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে যে গওহরবাণী ধ্রুপদ গান আমরা শুনে থাকি তার মধ্যে নওহরবাণীর তুলনায় উদ্দীপনার অভাব থাকলেও, অন্যান্য গানের তুলনায় ধ্রুপদ গানের গাম্ভীর্য্য প্রামাণ করে যে সে যুগে এ ধরণের গানের অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল ও কাজী নজরুল ইসলামের বহু সঙ্গীত রচনায় আমরা এই ধরণের গান পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল জীবনে বহু শোকতাপ, বাধা-বিপত্তি ও বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন তাঁকে বহুবার হতে হয়েছিল কিন্তু আপন মানসিক দৃঢ়তায় তিনি নির্ভীকভাবে সে সব সমস্যাকে গ্রহণ করেছিলেন। যে আড়াই' হাজার রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমরা পেয়েছি তার একটা বড়ো অংশই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে, তাই তাঁর বহু সঙ্গীত রচনায় আমরা নির্ভীক মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাই। মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমাদের অনেকের থেকেই বেশী করে কিন্তু সেই মৃত্যুশোককে তিনি জয় করে রচনা করেছেন—

১। বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী

২। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক

৩। দুঃখ যদি না পাবে ত

৪। মোর মরণে তোমার হবে জয়

বিপদের সম্মুখীন হতে তিনি প্রার্থনা করলেন—

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়

শ্রান্তি, অবসাদ দূর করতে তিনি লিখলেন—

১। হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে

২। যিনি সকল কাজের কাজী

চিত্তের অস্থিরতা দূর করতে রচিত হলো—

১। যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর
তবে দয়া করো হে, দয়া করো হে, দয়া করো ঈশ্বর।

অন্যায়ের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

১। সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ

২। প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল একি দুর্দ্দিন

৩। জাগো, হে রুদ্র জাগো

৪। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি

৫। তিমিরময় নিবিড় নিশা

কাপুরুষতাকে আঘাত করতে রচিত হলো—

১। ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার

২। কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি

৩। ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ

আঘাত সহ্য করবার শক্তি সঞ্চয় করতে লিখলেন-

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো

উপরে যে গানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ধর্ম্ম-সঙ্গীতের অন্তর্গত কিন্তু কাব্যাংশ ও সুর সংযোজনার বিচারে এই সব গানে যে বলিষ্ঠ আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় তা কেবলমাত্র যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট পর্য্যায় তা নয়, এই সব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের স্বরূপ। ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্গত এই ধরণের আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করা যায়—

১। ঐ মহামানব আসে

২। ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়

এর আগে ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্গত যে সব গানে পৌরুষ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও কয়েকটি গানে যৌবনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস যে ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে সঙ্গীত রচনাক্ষেত্রে তা বিরল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চির নবীনের উপাসক তাই এই সব গানে তিনি কথায় ও সুরে যৌবনের জয়গান সার্থক ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। ফাল্গুনী, নবীন, তাসের দেশ ইত্যাদি নাটকগুলির ভাবার্থই হল এই যৌবনের জয়গান। এই তিনটি নাটকের কয়েকটি গান ছাড়াও এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত কয়েকটি গানের তালিকা দেওয়া হলো—

১। আমরা নূতন যৌবনেরি দূত

২। সব কাজে হাত লাগাই মোরা

৩। একসূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন

৪। এবার তো যৌবনের কাছে হার মেনেছো

৫। ভালোমানুষ নইরে মোরা

৬। খর বায়ু বয় বেগে

৭। ওরে আয়রে তবে মাতরে সবে

৮। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল

৯। আমরা নূতন প্রাণের চর

১০। আমাদের ভয় কাহারে

১১। আমাদের পাকবেনা চুল গো

হৈ হৈ সঙ্ঘের জন্য রচিত নিম্নোক্ত গান কয়টিও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যদিও কাব্যাংশের বিচারে সেগুলি হাস্যরসাত্মক রচনা—

১। পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে

২। কাঁটাবনবিহারিণী সুরকনা দেবী

৩। না গান গাওয়ার দলরে মোরা

সম্মেলক সঙ্গীত পরিবেশনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন খুবই এবং এই কারণে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধারার অন্তর্গত বহুগানে এই আদর্শ রক্ষার্থে এমন সব সুর দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে তেজস্বিতার অস্তিত্ব বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশী সঙ্গীতে সুর সংযোজনার আদর্শও এই একই প্রকারের এবং এই সব গানের সুরের ভিতর দিয়ে উদ্দীপনার সৃষ্টি না করতে পারলে এই সব গান ব্যাপকভাবে আকর্ষণীয় হয় না। যে সব ঋতু-সঙ্গীতে কাল বৈশাখী ঝড় ইত্যাদির বর্ণনা আছে তার সুর-যোজনায় একটা উদ্দীপনা

সৃষ্টির প্রেরণা আছে। শরৎ ও বসন্তের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতেও সুর যোজনার ক্ষেত্রে এই বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়োজন—তাই রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কয়টি ঋতু-সঙ্গীত রচনাকে "উদ্দীপনার গান" এই পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে—

১। ঐ বুঝি কাল বৈশাখী
২। দারুণ অগ্নিবানে
৩। আমরা সবাই রাজা
৪। এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
৫। আহ্বান আসিল মহোৎসবে
৬। হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
৭। থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ
৮। গগনে গগনে ধায় হাঁকি
৯। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
১০। এসো এসো বসন্ত ধরাতলে
১১। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে

উপরোক্ত গানগুলি ছাড়াও "পিনাকেতে লাগে টঙ্কার" এবং শিল্পোৎসবের গান "নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র" এই দুইটি গানকে "উদ্দীপনার গান" পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে। সুর সংযোজনা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সব উদ্দীপনার গানে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ ও খেয়াল পদ্ধতির রাগসম্মত সুর এবং মিশ্ররাগের সুর ও লোক-সঙ্গীতের সুর সমভাবেই ব্যবহার করেছেন।

"বিদেশী সুরের গান"

"বিদেশী সুরের গান" এই পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই সব সঙ্গীত-রচনাকে, সে সব গানের সুর তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত, পাশ্চাত্য-সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি থেকে। এই পর্য্যায়ের গান সম্পর্কে অনেকেই বলে থাকেন যে এগুলি অনুকরণদুষ্ট, এতে তাঁর সৃষ্টির স্বার্থকতা নেই। এই ধরণের অহেতুক এবং বিকৃত সমালোচনা সমালোচকদের নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। সঙ্গীত-সাধনা এবং শাস্ত্রসম্মত গবেষণার মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতে এই যে এত বিভিন্ন ধারার শাখা-প্রশাখা যুগ, রুচি ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করেছে, এর দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়নি কিন্তু সঙ্গীত সাধকদের সৃজন প্রতিভার বিকাশ এই সব ধারার মধ্যে পরিষ্কার ভাবেই বর্ত্তমান এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বরাবরের জন্যই সঙ্গীত-সাধকদের মূলধন থাকবে, সঙ্গীত-স্রষ্টার নিজ প্রতিভার প্রয়োগ নৈপুণ্যে যে সংস্কার সাধিত হয় তার ফলেই হয় এই সব শাখা প্রশাখার সৃষ্টি। যে কোন সুরকার বা সঙ্গীত-শিল্পীর প্রাথমিক জীবনে সঠিক শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন এবং এই শিক্ষাজীবনে তাদের

বিভিন্ন সঙ্গীতের অনুকরণীয় আদর্শগুলি গ্রহণ করতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং এই সময়কার রচনার মধ্যে সেই সব শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রভাব থাকাই নীতিসম্মত। নানাবিধ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে পরবর্ত্তীকালে সঙ্গীত-স্রষ্টার আপন সৃষ্টির বিকাশ হয় এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনা পর্য্যালোচনা করলে আমরা এই সত্যটাই বুঝতে পারি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইতিহাসের আদিযুগে ও মধ্যযুগে তাই আমরা দেখতে পাই সেই সব ভাঙ্গা-গানের অস্তিত্ব যাদের লেশমাত্র নেই শেষযুগে অর্থাৎ পরিণত বয়সের রচনায়। কিন্তু এই সব ভাঙ্গা-গানের মধ্যেও আশ্চর্য্যভাবে লক্ষ্য করা গেল যে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, অন্যান্য প্রাদেশিক বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণে যে সব গান রচনা করেছেন তাঁর বাল্য-জীবনে ও যৌবনকালে, তার মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবেই রক্ষিত হয়েছে। অনুকরণদুষ্ট হলেও তিনি তাদের বিজাতীয় করে তোলেননি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সৃষ্টির সার্থকতার পরিচয় এইখানেই সব চেয়ে বেশী।

"বিদেশী সুরের গান" এই পর্য্যায়ে রবীন্দ্রনাথের যে সব রচনা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আমরা পাই মারাঠী, গুজরাটী, কর্ণাটী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মহীশূরী, এবং পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের গানের সুর নিয়ে যে সব সঙ্গীত রচিত হয়েছে সেইগুলি। এর পরে স্বতন্ত্রভাবে এই সব গান নিয়ে আলোচনা করব—

অন্যান্য প্রাদেশিক সঙ্গীতের সুরের রচনা—মহীশূরী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী ও কর্ণাটী গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো—

রবীন্দ্রনাথের গান	মূলগান	
বিশ্ববীণারবে	নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস (শঙ্করাভরণ)	মারাঠী
চিরসখা মোরে ছেড়ো না	—	মহীশূরী
যদি আসে তবে কেন	—	মহীশূরী
চিরবন্ধু চিরনির্ভর	—	”
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	—	”
আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে	—	”
কোথা আছ প্রভু	—	গুজরাটী
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	—	”
নমি নমি ভারতী	—	”
যাওরে অনন্ত ধামে	—	”
বড় আশা করে	সখী বা বা	কর্ণাটকী
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে	পূর্ণচন্দ্রাননে চিন্ময়হরণে	”
সকাতরে ওই কাঁদিছে	চারি বর্বা পর্যন্ত	”
বাজে বাজে রম্য বীণা	বাদে বাদে রম্য বীণা বাদে	পাঞ্জাবী
এ হরি সুন্দর	এ হরি সুন্দর	”
বাজে করুণ সুরে	নিতু চরণ মূলে	মাদ্রাজী
বাসন্তী, হে ভুবনমনোমোহিনী	মীনাক্ষী মে মুদম্	”
নীলাঞ্জন ছায়া	বৃন্দাবন লোলা	”

লোকসঙ্গীতের সুরের রচনা—রামপ্রসাদী ও কয়েকটি বাউল গান ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রচনা করেছিলেন তার তালিকা দেওয়া হলো—

রবীন্দ্রনাথের গান	মূলগান
আমি শুধু রইনু বাকী	রামপ্রসাদী সুর
আমরা মিলেছি আজ	" "
শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা	" "
যদি তোর ডাক শুনে কেউ	হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে
আমার সোণার বাংলা	আমি কোথায় পাব তারে
এবার তোর মরা গাঙে	মন মাঝি সামাল সামাল

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের রচনা—

রবীন্দ্রনাথের গান	মূল গান
কালী কালী বলরে আজ	Nancy Lee
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে	Ye bank and braces
সকলি ফুরালো	Rabin Adair
মানা না মানালি	Go where Glory
তুই আয়রে কাছে আয়	The British Grenadeirs
পুরানো সে দিনের কথা	Auld Lang Syne
কতবার ভেবেছিনু	Drink to me only
ও দেখবি রে ভাই	———

উপরোক্ত গানগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা আছে যার মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশী করে পাওয়া যায় যেমন—

১। আহা জাগি এ বসন্তে
২। আমি চিনি গো চিনি তোমারে
৩। ধরা দিয়েছি গো
৪। তোমার হলো স্বরু। ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত গানগুলি ছাড়াও বাংলা রাগসঙ্গীত ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র গান রচনা কোরেছেন তা হলো "চাঁচর চিকুর আধো" এই গানের সুরে রচিত "বেঁধেছ প্রেমের পাশে।" এই পর্য্যায়ভুক্ত না হইলেও একটি গানের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা— এই গানটি হলো ইংরাজিতে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সঙ্গীত রচনা যেটি ১৯১৫ সালে George Colderon কৃত 'দালিয়া'র ইংরেজী নাটক The Maharani of Arakan এর জন্য রচিত হয়। গানটির প্রথম পংক্তি হলে "The bee is to come, the bee is to hum" বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি সুরের যে সব রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমরা পেয়েছি সে গুলি রবীন্দ্রনাথের খুবই অল্প বয়সের রচনা। মাদ্রাজী সুরের গানগুলির রচনাকাল ১৯৩১ সাল।

ধ্রুপদ ও ধামার

আত্মসংযম ও নিষ্ঠার অভাবের জন্য, সঙ্গীতকে সহজতর করবার একটা চেষ্টা চলে আসছে বহুদিন থেকেই—মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে যে ধ্রুপদ ছিল সঙ্গীত-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট, খেয়াল জাতীয় গানের চাপে তা ধ্বংশ হতে চলেছিল যেমনি ঠুংরীর প্রসারে খেয়াল আজ তার বৈশিষ্ট্য হারাবার পথে। সুখের বিষয় যে, আংশিক ভাবে হলেও, ধ্রুপদ ক্রমশই তার মর্য্যাদার আসনে ফিরে আসছে এবং বাংলা গানের মধ্য দিয়ে এই লুপ্তপ্রায় সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের কৃতিত্বের একটা বড়ো অংশই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। একদিন ধ্রুপদ গানকেই একমাত্র শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত বলা হতো। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ যুগেরই মানুষ ছিলেন তাই তাঁর সঙ্গীত রচনার মধ্যে ধ্রুপদ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনার মধ্যে প্রথম ও মধ্যযুগের গানে ধ্রুপদের প্রভাব খুবই বেশী এবং শেষ যুগের রচনা ধ্রুপদের প্রভাবমুক্ত হলেও, যে অলঙ্করণ নীতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা ধ্রুপদ ও টপ্পার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—

"আমরা বাল্যকাল থেকে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করে।

এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটি জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। প্রাচীন ক্লাশিকাল অর্থাৎ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক—তাতে দুর্ব্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে, আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে।”

স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য কি? প্রায় প্রত্যেক ধ্রুপদ গানেই চারটি তুক কিংবা পদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ধ্রুবপদ্ধতির গানের পরিবেশনে মীড় গমক ও আশের ব্যবহারই সমধিক। তালের মধ্যে চৌতাল, আড়া-চৌতাল, তেওড়া, ঝাঁপতাল, ও সুরফাক্তা এই কয়টি তালই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের বিষয় হলো ধর্ম্ম, প্রকৃতির বন্দনা ও রাজার গুণগান। ধ্রুপদের রস শান্ত ও গম্ভীর, বাহুল্য বর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য তার অন্তরের, এবং এই কারণেই ধ্রুপদে তানের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ধ্রুপদের গতি হলো গজের যেমন সর্পগতি হলো ধামারের। যার কণ্ঠে তান অজস্র, স্বর কম্পমান, যাঁর স্বভাবে সংযম নেই তার পক্ষে প্রকৃত ধ্রুপদী হওয়া সম্ভব নয়। ধ্রুপদের বাঁধুনি ও রাগ-

বিস্তারের পদ্ধতি খুব ধরা-বাঁধা ও ছন্দবদ্ধ। ধ্রুপদীয়ারা প্রাণপণে চেষ্টা করতেন শিখে নেওয়া গানগুলির চেহারা হুবহু বজায় রাখতে এবং রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানেও এই একই আদর্শ লক্ষ্য করা যায়।

একটি বিশিষ্ট ঘরোয়ানার সঙ্গীত-শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ধ্রুপদ গানে তান, বাটের ব্যবহার করে থাকেন—এর প্রধান কারণ হলো, যে সব গানের সুর ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই সব গান রচনা করেছেন, সেই সব মূল হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানগুলি এই ঘরোয়ানার অন্তর্ভুক্ত। ধ্রুপদ গান মাত্রেই তানের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত নয়, তবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পরিবেশনে শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতার ফলে হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অশাস্ত্রীয় পরীক্ষা চলে আসছে কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এইরূপ তান বাটের ব্যবহার নিন্দনীয় কেননা এর ফলে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হবে তার মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামান্যতম বৈশিষ্ট্যও খুঁজে পাওয়া যাবেনা আর বৈশিষ্ট্যহীন রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির পক্ষে অবমাননাকর। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর গানের কাব্যাংশকে কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেননি, সুরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সে গান লোক-সঙ্গীতের সুরেই হোক আর ধ্রুপদ, খেয়াল জাতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্য্যায়েরই হোক। তাল বাটের ব্যবহারে কাব্যাংশের মর্য্যাদা রক্ষিত হতে পারে না এ কথা

সঙ্গীত সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাও উপলব্ধি করবেন। "কাব্য-সঙ্গীত" পর্য্যায়ের অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, বিষয়গত প্রয়োজনে এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজনীয়—

"সংসারে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলন-সাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্য মহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে। ······হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্য, ওস্তাদী করবার জন্য নয়। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি—কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে সেতো আতিথ্য দিতে আসবেনা, সে নিজেকে দেবে নইলে উভয়ের মিলন হবেনা। আমাদের গানে হিন্দুস্থানী যতই বাঙ্গালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ উপরোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যে পরিস্ফুট,—অধিক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ্ধতির রচনার অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত আবার ঋতুসঙ্গীতেরও অভাব নেই। ধ্রুপদ ও ধামার পর্য্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার সংখ্যা পঞ্চাশের

থেকে বেশী। পূর্ব্ববর্ত্তী "হিন্দি-ভাঙ্গা ও গৎ-ভাঙ্গা গান" অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ্ধতির রচনার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের এই পর্য্যায়ের রচনার অধিকাংশই হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের স্থুর নিয়ে রচিত—তাই এই অধ্যায়ে সেই গানগুলির পুনরুল্লেখ করা হলো না। ধামার যদিও চৌদ্দ মাত্রার একটি তালের নাম, কিন্তু এই তালের ধ্রুবপদ্ধতির সঙ্গীত পরিবেশনে আদর্শগত একটা পার্থক্য আছে যে সম্পর্কে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। এই কারণে তালের নামানুসারে হলেও, ধামার একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীতরীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং খেয়ালের ক্ষেত্রে যেমন বিলম্বিত লয়ের গানের পরে দ্রুত লয়ের গান গাইবার রীতি আছে, তেমনি ধ্রুপদীয়ারা ধ্রুপদ গানের পরে ধামার পরিবেশন করে থাকেন।



পরিশিষ্ট

উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত গানের তালিকা

অ

গানের প্রথম পংক্তি

আ

গানের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
আজি গোধূলি লগনে	৩৮
আজি ঝড়ের রাতে	২১
আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে	৮০
আজি দখিন দুয়ার খোলা	২৩, ১৩২
আজি দখিন পবনে দোলা লাগিল	১৮৯
আজি প্রণমি তোমারে চলিব	৮৯, ১৫৫
আজি বরিষণ মুখরিত	৩৭, ৮৬
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে	২০, ১৩২
আজি বহিছে বসন্ত পবন	১৬, ৫৬, ৭৩, ১৪২, ১৯৪
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে	২৭
আজি মম মন চাহে	৭৬, ১৪২, ১৯৪
আজি মেঘ কেটে গেছে	৩৯
আজি যত তারা তব আকাশে	১৫৯
আজি যে রজনী যায়	১৫, ১২৭, ১৮৪
আজি শরত তপনে	১৫৯
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে	১৯৫, ২০৬
আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে	২২, ৯০
আজিকে এই সকাল বেলাতে	২৪
আজু সখি মুহু মুহু	৯৯
আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে	১৬, ৯২, ১৪৩, ১৫৫, ১৯৫
আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে	১৫, ৭৮, ১১৮
আনন্দ তুমি স্বামী	১৯, ৭৫, ৯২
আনন্দ রয়েছে জাগি	৮৯

গানের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা

এ

ঝ

প

গানের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
যদি ঝড়ের মেঘের মতো	২০০
যদি তারে নাই চিনিগো	৩০
যদি তোর ডাক শুনে কেউ	১৯, ১১৯, ১২২, ২০৭
যদি তোর ভাবনা থাকে	২০
যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে	২৪, ১৯৭
যমের দুয়ার খোলা পেয়ে	১৩৯
যা হারিয়ে যায়	১১৫
যাওরে অনন্ত ধামে	২ ৬
যার অদৃষ্টে যেমনি জোটে	১৫, ১৩৯
যাবার বেলা শেষ কথাটি	৩১, ১৬০
যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়	৮২
যায় যাবে প্রাণ তবু	৯৫
যিনি সকল কাজের কাজি	২৩, ২০০
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৩৯, ১৮৮
যে তরণীখানি ভাসালে	২১
যে তোরে পাগল বলে	২০
যে তোরে বাসেরে ভালো	৯৫
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	১৯, ১১৯, ১২২
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি	২৪, ১৫৯
যেতে যেতে একলা পথে	৭৯
যেথায় তোমার লুট হতেছে	৭১, ১৯৬
যেথায় থাকে সবার অধম	২২

গানের প্রথম পংক্তি | পৃষ্ঠা

গানের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
সার্থক করো সাধন	৮৩
সার্থক জনম আমার	১১৯, ১২২, ১২৭
সার্থক হলো সাধন	৮৪
সারা বরষ দেখিনে মা	১২
সীমার মাঝে অসীম তুমি	২২, ১৫৪, ১৯৭
সুখহীন নিশিদিন	১৯, ১৪৫, ১৯৫
সুখে থেকো আর	১৬
সুধা-সাগরতীরে এসেছে	১৬, ৯০, ১৪৩, ১৯৪
সুন্দর বহে আনন্দ	১৮, ৭৫, ৮৮, ১৪৩
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি	৬৭, ৯৮, ৯৯
সুমঙ্গলী বঁধূ	১৩৬
সুরের জালে কে জড়ালে	৩৯
সে আমার গোপন কথা	১৮৯
সে কী ভাবে গোপন রবে	৩০
সে কোন বনের হরিণ	২৭, ৬৯
সেদিন আমায় বলেছিলে	১৭ , ১৮৯
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে	৩৪, ১৮৮
সে যে পাশে এসে বসেছিল	৫৭
স্বপন লোকের বিদেশিনী	৮২
স্বপন যদি ভাঙিলে	১৪৪, ১৫৫
স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে	১৮৮
স্বপ্ন মদির নেশায় মেশা	৮২
স্বপ্নে আমার মনে হলো	৪০

শুদ্ধিপত্র

।	পংক্তি	অশুদ্ধ মুদ্রণ	শুদ্ধ
৫	৯	পূর্ব্বের নায়	পূর্ব্বের ন্যায়
৯	১৯	পশ্চাত্য সুর	পাশ্চাত্য সুর
৯	২১	সঙ্গীতিক আবহাওয়ার	সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার
১২	৮	সঙ্গে মিশাইয়াছিলেন	সঙ্গে মিশিয়েছিলেন
১২	১৫	হেদে গো নন্দ রাণী	হেদে গো নন্দরাণী
১৬	৮	চির নির্ভয়	চির নির্ভর
১৯	২০	আজি তুই	মা কি তুই
২৯	৯	'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্টান	'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান
৩০	৩	তোমার সুরের ধারা	১৯১৫ সালের রচনা ভুলক্রমে পুনরায় এস্থলে মুদ্রিত হয়েছে।
৩০	১৬	পৌষ তোদের ডাক	ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়েছে, ১৯২৬ সালের তালিকায় সঠিক আছে।
৩১	১৯	এসো নীপবনে ছায়া বীথিতলে	এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
৩৫	২	বাসন্তী হে ভুবনমনোমোহিনী	বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী
৫৯	২২	খরবায়ু বয়	খর বায়ু বয়
৬৬	১	(ভূপালি)	(ভূপালী)
৭১	১	ররীন্দ্রনাথের	রবীন্দ্রনাথের
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ওঠে না।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ মুদ্রণ	শুদ্ধ
৮৯	৪	ভক্ত হৃদি বিকাশ	ভক্ত হৃদ্‌বিকাশ
৯০	৮	শুদ্ধ মল্লার	মিঞা-মল্লার
৯২	৭	বাসন্তী হে ভুবনমনোমোহিনী	বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী
৯৪	৯	আজ একেলা বসিয়া	আছ একেলা বসিয়া
৯৯	১১	অতিমির রজনী	সতিমির রজনী
১০৫	১০	জননী তোমার চরণখানি	জননী তোমার করুণ চরণখানি
১১৪	২০	পরবর্ত্তী	পরবর্ত্তী
১১৫	১১	সখি, বয়ে	সখি, বহে
১১৯	৪	১৩১৮ সালে	১৩১৮ সাল
১৭২	১৩	দূরদেশী ঐ রাখাল	দূরদেশী সেই রাখাল
১৮৪	৮	ছন্দ প্রাচুর্য্যে	ছন্দ প্রাচুর্য্য
১৮৮	৪	সে ছিল আমার	যে ছিল আমার
১৮৯	৯	নিলাঞ্জন ছায়া	নীলাঞ্জন ছায়া
১৯৪	১৯	আয়ো ফগুণ	আয়ো ফাগুন
১৯৬	২	বাসন্তী হে ভুবনমনোমোহিনী	বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী
১৯৭	১	আমার সকল দুঃখের	আমার সকল দুখের
২০৬	২২	বাসন্তী হে ভুবনমনোমোহিনী	বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী
২০৮	৮	না হইলেও	না হলেও
২১৭	৫	আজি দখিন	আজি দক্ষিণ